সুন্দরবন

সুন্দরবন

শিবশঙ্কর মিত্র

পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা ৭২

মুখবন্ধ

নিবিড় সবুজঘন বনানী, তার শ্বাপদকুল, তার রঙ-বেরঙের উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, আর সেই সঙ্গে অগণিত গভীর ও অগভীর আঁকাবাকা নদী-উপনদীর তরৃতর্ শ্বেত স্রোতোধারা নিয়ে সমগ্র সুন্দরবনের রূপও যেমন অপরূপ, তেমনি সে-বনের উপকূলবাসী নরনারীর হাসি-কান্নাও বুঝি—বুঝি কেন, নিশ্চয়ই—সে-রূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অনির্বচনীয়। তাই সুন্দরবনের খণ্ড জীবনের বিচিত্র স্বাদের হাসি-কান্নাগুলি ভিন্নতর নামে গণ্ডীভূত করা অহেতুক ও অবান্তর বলে মনে হয়েছে।

স্বনামধন্য শিল্পী শ্রী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর সুনিপুণ তুলির আঁচড়ে এই গল্পের ডালিকে শিল্পসজ্জায় আশ্চর্য সমৃদ্ধ করেছেন, কিন্তু কোনও দৃশ্য-পটকে পৃথক অভিধায় চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হননি। সুতরাং গ্রন্থভুক্ত কাহিনী এবং তার অঙ্গসজ্জাকে বোধহয় একটি নামেই বিধৃত করা যায়—সে-নাম 'সুন্দরবন'।

হালকা তুলির টানে শিল্পীপ্রবর পুস্তকখানিকে যেভাবে সুষমামণ্ডিত করেছেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই সুযোগে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নাভানা প্রিন্টিং-এর পরিচালক শ্রী কুনাল রায়ের বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় সম্ভ্রম ও মমতা থাকার ফলেই নাভানার নাম আবার গুণীজনের মুখে-মুখে, আর সেই সঙ্গে শ্রদ্ধেয় কবি বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যপ্রীতি ও পুস্তক-প্রকাশনায় তাঁর তুলনাহীন দক্ষতায় নাভানা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত। 'সুন্দরবন' বইটির এই নতুন নাভানা-সংস্করণের জন্য এঁদের দু'জনের কাছে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী হয়ে রইলাম।

উন্নত মানের প্রকাশনায় মুদ্রণকে যথাসম্ভব নির্ভুল করে তোলার দায়িত্বও কম নয়। প্রুফ-সংশোধনে কন্যাপ্রতিম শ্রীমতী মমতা চাকির আগ্রহ ও প্রচেষ্টার জন্য তার কাছেও আমার ঋণ স্বীকার করছি।

গ্রন্থকার

স্নেহের ইন্দ্রাণীকে

এক

বুড়ো আয়না মিস্ত্রি শুধু বুড়োই হয়নি, খানিকটা অথর্বও হয়ে পড়েছে। চোখেও কম দ্যাখে। কিন্তু বুড়ো হলেও বেশি কথা বলে না। তবে কথা যখন বলবে, একটা বিরক্তি ভাব নিয়েই যেন বলবে। সব কাজে সবার উপর বিরক্ত হয়েই আছে।

ডিঙি সরিয়ে কিনারা থেকে বেশ কিছুটা দূরে আয়না মিস্ত্রি লগি পুঁতছিল—রাতের মতো যাতে ডিঙিখানি কায়েমী করে বেঁধে রাখা যায়। লোনা জোয়ার-ভাটির দেশ। সাবধানের মার নেই। জেহের

ওজন দিয়ে বুকের মধ্যে সাপ্‌টে লগি পুঁততে পুঁততে মিস্ত্রি রহিম বাওয়ালিকে বলল,—তোদের আর শখ মেটে না। বুড়ো হয়ে গেলি, তবু পাখির শখ গেল না! বেলা গড়িয়ে যায়, কোথায় ডিঙিতে আসবি, তা না, পাখি ধরবে। বনে এলেই যেন তোরা ছোক্‌রা হয়ে যাস!

রহিম বাওয়ালি বুড়ো মিস্ত্রিকে অমান্য না করেই বলল,—না, মিস্ত্রি, এখনও বেলা ঢের আছে। তুমি তো চোখে কম ছাখ। মেয়েটা আসবার সময় বলেছিল একটা পাখির কথা। আমি এক্ষুনি ফিরব। তুমি কিন্তু ফজরকে ডেকে নিও। ঐ ওপারে কাঠ কাটছে। তালতলার বনে বেলা পড়ার আগেই ডিঙিতে ওঠা ভালো।

তালতলার বন। এমন কেন নাম হলো, তার কোনও হদিশ নেই। এখানে কেন, গোটা সুন্দরবনের কোথাও তালবন তো দূরের কথা, তালগাছের চিহ্নও মিলবে না।

এঁকে বেঁকে বনের ভিতর চলে গেছে খরস্রোতা খাল। খুব চওড়াও নয়, খুব সরুও নয়। এত জায়গা থাকতে কেন যে সুন্দরবনের পাখিরা এই খালটিকে পছন্দ করেছে—কেউ বলতে পারে না। এখানে ঢুকলেই দেখা যাবে নানা রঙের পাখি এই উড়ছে, এই বসছে। মাছ-রাঙা, চিল, চাতক, ফিঙে, গয়াল, মানিক, মদনা, শামখোল, দুধরাজ, রক্ত-রাজ, ভীমরাজ,—তাছাড়া তো বক আছেই। এত বক, যে এক একটা গাছের মাথা সাদা হয়ে থাকে। তারই জন্য আবাদের মানুষ খালটির নামকরণ করেছে—বক্‌-খাল।

আজ তিনদিন হলো ওরা এসেছে এই বক্‌-খালে। এসেছে নোনা-খালি আবাদ থেকে। কয়রা নদীর উত্তরে নোনাখালি খুলনা জেলার অন্যতম দীর্ঘ আবাদ। উঁচু-ভেড়ি গোল হয়ে ঘিরে আছে এই আবাদকে। ভেড়ির পাশে পাশে বসতি। মাঝখানে ধুধু করছে ধানের খেত। খেতের ঠিক মাঝে কিন্তু আজও জমি ওঠেনি। সারা বছরই জল থৈথৈ করে সেখানে। এই আবাদেরই পুবদিকে আয়না মিস্ত্রির বাড়ি। বাড়ির পাশেই এক অশ্বত্থ গাছ। হিন্দুই হোক আর মুসলমানই

হোক, সকলেই দূর দূর গ্রাম থেকে এসে এই গাছের ঝুরি ও ডালে ইট বেঁধে মানত করে বনদেবীর নামে। লোনা দেশে অশ্বত্থ গাছ হওয়াই এক আশ্চর্য। তাই ভাটি-দেশের মানুষ অবাক হয়ে বিশ্বাস করে - এই গাছের আশ্চর্য ক্ষমতা না থেকেই যায় না।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে রাত্রে এই অশ্বত্থ গাছ এক ভীতির বস্তু। অন্ধকারে তারা কেউ এর ধারে কাছে আসতে চায় না। কিন্তু দিনের আলোয় এই গাছের তলায় ছেলেমেয়েদের হৈ-হল্লা লেগেই থাকে। পাড়ার দশবছরের মেয়ে মমতাজও ছেলেমেয়েদের কোলাহলের টানে রোজই এই গাছের তলায় আসে। দু'একটা খেলাতেও যোগ দেয়। তবু মমতাজ যেন কেমন নির্জীব। বেশির ভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকে।

অন্যেরা তা সইবে কেন? তারা কখনও অনুরোধ করে, কখনও বা টেনে জোর করে খেলায় নামাতে চায়। নামেও মমতাজ। কিন্তু আয়না মিস্ত্রিকে একবার দেখলে কেউ আর মমতাজকে টানাটানি করতে যায় না। আয়না মিস্ত্রি যেন মমতাজের এক আশ্রয়। মমতাজ ব্যাকুল হয়ে আয়না মিস্ত্রির অপেক্ষা করে - না, আয়না মিস্ত্রি মমতাজের টানে আসে এই অশ্বত্থ গাছের তলায়—তা বলা দুঃসাধ্য। মিস্ত্রি এলে মমতাজ তার কাছে গিয়ে বসবে, আর এটা-সেটা গল্প করেই চলবে।

মিস্ত্রি মমতাজকে কাছে পেলেই বলবে,—জানিস, তোর আম্মা আমাকে কেমন ঘটা করে সাবুদ খাইয়েছিল! কত রকম যে মাছ খাইয়েছিল, তা তুই বলতেই পারবি না! ....

মায়ের কথা উঠতেই মমতাজ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মায়ের খুঁটিনাটি কথা শুনবার আগ্রহ তার থামতে চায় না। বলে,—নানা! আম্মা কেমন রাঁধতো? আচ্ছা, আম্মা কোন পথে জল আনতে যেতো? তার মাথায় কি ঘোমটা থাকতো?... প্রশ্নের যেন অন্ত নেই। সে-প্রশ্নের কারণ অকারণও নেই।

আয়না মিস্ত্রি এমনিতে সব সময় বিরক্ত হয়ে থাকলে কি হবে

মমতাজকে একবার পেলে গল্প করবার, আজে-বাজে কথা বলবার, আমোদ-আহ্লাদ করবার নেশা তাকে পেয়ে বসে। সে আজ দশ বছরের কথা—তার সবচেয়ে ছোট মেয়ে মারা যাবার পর থেকে মিস্ত্রি এমনিধারা খিটখিটে হয়ে গেছে। এক মমতাজকে পেলেই বুড়ো অন্য রকম হয়ে যায়। অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার তামাক খাবার আকর্ষণও সেজন্যই।

মমতাজের বা'জান রহিম বহুদিন ধরে বাওয়ালির কাজ করে। বাওয়ালির কাজ মানে, প্রায়ই বনে যেতে হয়। বাঘ তাড়াবার কাজ। কাঠ, মধু, বা গোলপাতা কাটবার দলের রক্ষক হয়ে বাওয়ালিদের সুন্দরবনে যাওয়া মানে—এক এক সময়ে একমাস দু'মাস কাটিয়ে আসা। কাজেই বছরের বাকি অল্প সময়টুকু যখন সে বাড়ি থাকে, মা-হারা মমতাজকে যেন বুকের মধ্যে করে রাখে। আদরে যেন সে মায়ের স্নেহকে পূরণ করে দিতে চায়।

এবার অবশ্য মাত্র তিন-চারদিনের জন্য বনে এসেছে। জ্বালানি কাঠ কাটবে। নিজের সংসারের জন্য। জ্বালানি কাঠ কাটতে তেমন হাঙ্গামা বা গাছ বাছাবাছি নেই। বনে আসবার সময় মমতাজ বা'জানকে আব্দার করে বলেছিল,—এবার তোমাকে আমার জন্যে একটা পাখি এনে দিতেই হবে। কতবার বললে, এনে দেবে। একবারও তুমি দাও না।

আব্দারের উত্তরে বাওয়ালি যেন অপরাধীর মতো বলল,—বরাবরই তো পরের কাজে বনে যাই। এবার তো নিজের কাজ, নিশ্চয় সময় অনেক পাব। এবার তোকে ঠিকই এনে দেব। তুই কিন্তু ঘরদোর সামলে রাখিস।

*　　　*　　　*

আজ তালতলার বনে সাঁজের বেলা পাখির কথা উঠতে বুড়ো মিস্ত্রি তিতিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু মমতাজের আব্দারের কথা শুনতেই আর দ্বিতীয় কথাটি বলেনি।

রহিমের মতলব, এবার গয়াল পাখি সে একটা ধরবেই। দড়ির জাল ও আঠা দিয়ে আগে থাকতেই ফাঁদ পেতে রেখেছে। ডিঙি থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে একটা কেওড়া গাছ। কিছুটা হেলে আবার খাড়া হয়ে উপরে উঠেছে। মাথায় ঝাঁকাল পাতা। রহিম এই গাছটি বেছেই ফাঁদ পেতেছিল।

বাওয়ালি এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য একমাত্র তার, গয়াল পাখির ডাক শোনা যায় কিনা। আজ দুদিন ধরে এই গাছে গয়াল পাখিকে উড়ে এসে বসতে দেখেছে। কাছে এসেই উপর দিকে ভালো করে চেয়ে চেয়ে ছাখে—পাখি ফাঁদে পড়েছে কিনা।

একবার পাতার আড়ালে সামান্য একটু নড়তেই রহিমের বুঝতে বাকি রইল না। ফাঁদে পাখি আছে। কিন্তু খুব সাবধানে এগুতে হবে। যদি জানতে পায় তাকে কেউ ধরতে আসছে—অমনি ঝাঁপা-ঝাঁপি করে উঠবে। ফাঁদ থেকে মুক্ত হবার শেষ চেষ্টা সে করবেই।

বাওয়ালি তার কুড়ুলের ফলা পিঠের দিকে কোমরের বাঁধনের মধ্যে গুঁজে দিল। আপন ওজনে কুড়ুল ঠিকমতো ঝুলে রইল। ধীরে ধীরে এবার গাছে উঠেছে। সামনেই নিচু ডাল। বেশ মোটা ও শক্ত। তার ওপর দাঁড়ালেই আর একটি ডাল, হাতেই পাবে। সেটি ছাড়ালে আরেকটি সরু ডাল। তার ওপরেও কয়েকটি সরু ডাল-পালা চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। তারপর পাতার ঝাঁক। এই সরু লিকলিকে ডাল থেকে ফাঁদের দড়ি ঝুলছে। নিঃশব্দে এই দড়ি ধরতে হবে।

বাওয়ালির ভাবনা, কেমন করে নিঃসাড়ে গাছের মাথায় পৌঁছবে। কোনও শুকনো ডাল-পাতায় হাত পড়লে বনের সবাই চমকে ওঠে—পাখি তো দূরের কথা। বাওয়ালি উঠছে, ক্রমেই উপরে উঠছে। গুঁড়ি ও ডালের সঙ্গে বুক লাগিয়ে ও লেপটে। শরীরের ওজনটাও ঠিকমতো সরিয়ে সরিয়ে নিতে হবে। যতই ওপরে উঠবে, ততই সাবধানী হতে হবে। দেহের ওজন একটু বেতালে ঝুঁকে পড়লে গাছের ডাল কেঁপে উঠবেই উঠবে। সমস্ত মন, দৃষ্টি ও কান পাতার ঐ ঝোপের দিকে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে রহিম ওপরে উঠছে—নিঃশব্দে।

শুধু রহিম নয়। সুন্দরবনের এক হিংস্রতম জীবও। যার এক এক হাঁকে গোটা বন কেঁপে ওঠে। সেও নিঃসাড়ে, নিঃশব্দে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে বাওয়ালিকে অনুসরণ করে এসেছে। বাঘ দু'পায়ে ভর করে দু'থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে প্রথম ডাল পর্যন্ত।

বাওয়ালিও আরেক ধাপ ওপরের ডালে উঠে হাত বাড়িয়েছে ফাঁদের দড়ি ধরতে। বাঘ হয়তো আর দেরি করতে চায় না। এতদূর পর্যন্ত বাওয়ালির অলক্ষ্যে এসেছে। কেমন করে এলো, সে এক আশ্চর্য। দৃষ্টি এড়ালেও ঘ্রাণকে বুঝি আর এড়ান যাবে না। বাতাস বইছে বটে, কিন্তু বনের ভিতর হাওয়া মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়। একবার থমকে দাঁড়ালে বাওয়ালির নাকে দুর্গন্ধ যেতে এতটুকু দেরি হবে না। দুর্গন্ধ! না, বনের মাঝে এ গন্ধ দুর্গন্ধ নয়। আঁৎকে ওঠার গন্ধ। বাঘ হুঙ্কার দিয়েই ঝাঁপিয়ে উঠল প্রথম ডালে।

ততক্ষণে বাওয়ালি ফাঁদের দড়ি হাতের কব্জিতে জড়িয়ে ফেলেছে। বীভৎস হাঁকে কেঁপে উঠে চেয়ে ছাখে, পায়ের নিচে মৃত্যুর করাল মুখ-ব্যাদান! বাওয়ালি তার দীর্ঘ জীবনে এমন বাঘের ফাঁদে কোনও দিন তো পড়েনি। মন্ত্র! বাঘ তাড়াবার বাওয়ালি-মন্ত্র! বাক্‌শক্তি দূরের কথা, সর্বাঙ্গের পেশী অচল, চিন্তা শক্তিও স্তব্ধ!

বাঘ গোঁ-গোঁ করছে। হেলান গাছের প্রথম ডালে উঠেছে। কিন্তু তারপর। পরের ডালে রহিমের পা। এবার দু'পায়ে দাঁড়িয়ে তাকে ধরতে গেলে ঝুল সামলাতে পারবে কিনা,—তাতেই বোধহয় সে দোমনা।

বাওয়ালি স্তব্ধ হয়েই ছিল। দড়ির টানে না হলেও, বাঘের গন্ধে ও হুঙ্কারে ফাঁদের গয়াল পাখি মরণ-চিৎকার দিয়ে উঠেছে। মৃত্যুর সামনে চিৎকার তাহলে করা যায়! বাওয়ালি যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল। গলা ফাটিয়ে সেও গালি দিয়ে ওঠে। দু'পায়ের কেঁচকিতে ডাল জড়িয়ে ধরে দু'হাতে কুড়ুল বাগিয়ে ধরল। সুন্দরবনের কাঠুরিয়াদের

ছোট হাতলের মাথাভারি কুড়ুল। উদ্ধত হাতের কব্জিতে ফাঁদের পাখি ঝুলছে।

লব্ধ শিকারকে বাঘ আর অবহেলা করতে চায় না। বিকট হুঙ্কার দিয়ে উপরের ডালে বাওয়ালির পায়ে থাবা মারল। বিস্ফারিত বক্র নখের থাবা। বাওয়ালিও ক্ষিপ্ত। দেহের সর্ব শক্তি দিয়ে কুড়ুলের কোপ মারল বাঘের হাঁড়ির মতো মাথা লক্ষ্য করে। থাবার উপর শরীরের ভর থাকায় কুড়ুলের কোপের বাইরে মাথা সরাতে পারে না। সারবান সুন্দরী কাঠে যেমন করে কুড়ুল বসে যায়, তেমনি করেই বসে গেল বাঘের কানের পাশে।

অত বড় জীবের আর গাছের ডালে ঝুল রাখা সম্ভব নয়। নখের মধ্যে বাওয়ালির পায়ের মাংস ও আঙুল ছিঁড়ে নিয়ে ধপাৎ করে পড়ল মাটিতে। মানুষ ও বাঘের রক্ত ছিটকে পড়ল গাছের ডালে ডালে।

শিকার ও শিকারীর হাঁক-ডাকে বুড়ো আয়না মিস্ত্রির অনুমান করতে কিছুই বাকি থাকে না। ফজরও ছুটে এল। খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে মিস্ত্রির কাছে এসেছে। দুই বাপ-বেটায় এবার বড় বড় লাঠি নিয়ে হৈহৈ করতে করতে ডাঙায় উঠেছে। যদি কোনমতে বাওয়ালিকে রক্ষা করা যায়! মিস্ত্রি একবার শুধু দাঁত কিড়মিড় করে বলল —পাখি! পাখি চাই!

দু'জনে এগিয়ে দেখে, রক্তাক্ত বাওয়ালি জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে আছে। পায়ের পাতা খানিকটা উড়ে গেছে। রক্ত ঝরে পড়ছে। দু'জনে মিলে সমানে হাঁকাহাঁকি চিৎকার করেই চলেছে। বলা যায় না,— শালা কোথাও ওৎ পেতে থাকতে পারে। আতালি-পাতালি লাঠির বাড়ি মারে আর চিৎকার করে।

হঠাৎ বুড়ো আয়না মিস্ত্রি দাঁড়িয়ে পড়ে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। বাওয়ালির হাতের কব্জিতে ফাঁদের দড়ি জড়ান। গয়াল পাখিও আটকে আছে ফাঁদে। মিস্ত্রি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পাখির দিকে। চোখের কোণ দিয়ে তার জল

গড়িয়ে পড়ে।

ফজর সজোরে মিস্ত্রির বাহুতে নাড়া দিয়ে বলল,—কাঁদছ কেন? নাও, শীগ্‌গির,···বাওয়ালির ধড়ে প্রাণ আছে। বেঁচে আছে। নাও!

দু'জনে মিলে বাওয়ালিকে ধরাধরি করে ডিঙিতে নিয়ে এল। কাল-বিলম্ব না করে ডিঙি ছেড়ে দেয়। আর নয়, আর এক মুহূর্তও ওরা তালতলার বনে থাকতে চায় না। মাথায় জল ঢালতে ঢালতে, আর মুখে মিষ্টি জল দিতে দিতে বাওয়ালির চেতনা ফিরে এল। পায়ের পাতা জোরে বাঁধতে রক্ত পড়াও বন্ধ হয়েছে। তবুও বুড়ো মিস্ত্রির ভাবনা যায় না। তার সুদীর্ঘ জীবনে সুন্দরবনের বাঘে একবার ছুঁলে সে যে কাউকে বাঁচতে দ্যাখেনি।

পরদিন ভোরে ডিঙি নোনাখালি আবাদের যত কাছে আসতে থাকে বুড়ো আয়না মিস্ত্রি ততোই যেন কেমন হয়ে যায়—চঞ্চলও হয়ে ওঠে। বারবারই মনে পড়ে মমতাজের কথা,—তাকে কি বলবে। কি বলেই বা সান্ত্বনা দেবে। সে কি বা'জানকে দেখে শান্ত থাকতে পারবে? নিশ্চয় মুষড়ে পড়বে। আচ্ছা, তখন যদি গয়াল পাখি তাকে দিই? নিশ্চয় অনেকখানি শান্ত হবে। না, না, পরে না, আগেই, বা'জানকে দেখবার আগেই তাকে পাখিটি দেব। খুশি-মন থাকলে বা'জানকে দেখেও তখনকার মতো সামলে নিতে পারবে। আমিই তাকে হাতে করে গয়াল পাখি দেব ·····ছুটে গিয়ে দেব।

ডিঙি এগিয়ে চলে। গলুই-এর মাথায় পাখিটি বাঁধা। প্রথম প্রথম ছাড়া পাবার আশায় ঝাঁপাঝাঁপি করেছে। কিন্তু তারপর ঝিমিয়ে গেছে। গলাটা দেহের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে ঠোঁট আকাশ-মুখো উঁচু করে বসে আছে তো বসেই আছে। কিন্তু বনের পাখি এবার বন ছেড়ে ফাঁকা মাঠে লোকালয়ের কাছে আসতেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মিস্ত্রিও চঞ্চল। সে আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। একবার বাওয়ালির কাছে বসে, একবার গয়াল পাখির কাছে এগিয়ে যায়। মমতায় তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে চায়।

আবাদের ঘাটে ডিঙি লাগতেই মিস্ত্রির কল্পনা গুলিয়ে গেল। ধরাধরি করে ওপরে তুলবার সময় বাওয়ালি বলল,—মিস্ত্রি, কই, পাখিটি দিলে না !…দাও আমার হাতে।

মিস্ত্রি পাখির দিকেই তাকিয়ে। হাঁ বা না, কিছুই বলতে পারে না। ধীরে ধীরে বাওয়ালির হাতেই পাখিটি দিল।

বাওয়ালিকে কাঁধে করে চরের হাঁটু-সমান কাদা পেরিয়ে ওরা ভেড়ির ওপর উঠল। ভেড়ি পার হয়ে এবার ভিতর-মাঠে পড়েছে।

সকালবেলা অশ্বত্থ গাছের তলায় মমতাজ গুম্ হয়ে বসে ছিল। দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়েই ছুটে আসে। বাওয়ালিকে আর কাঁধে তুলে রাখবে কি ! মমতাজ বা'জানকে দেখেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

বাওয়ালির চোখেও জল ঝরে পড়ে। মমতাজের মাথায় হাত বুলিয়ে একবার শুধু বলল,—ভয় নেই, আম্মা,…বেঁচে আছি ! বলেই সে গয়াল পাখিটি মমতাজের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করল।

অশ্রুসিক্ত চোখে মমতাজ নজর দেয় পাখিটির দিকে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে একটানে পাখিটি ছিনিয়ে নিয়ে উড়িয়ে দিল আকাশে।
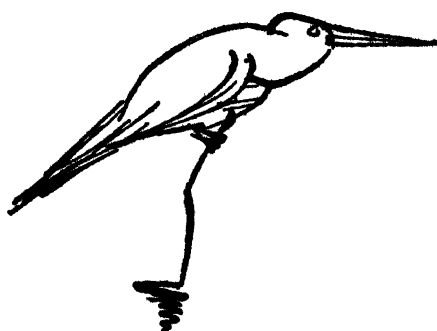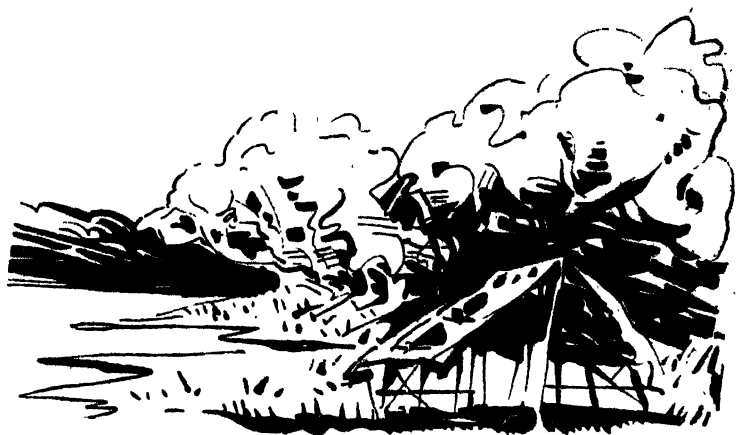
দুই

চৈত্র মাসের নোনা-ফাটা রোদ। কেওড়া গাছের ছায়ায় পাড়ার দুই দুরন্ত ছেলে—আছের ও সোনা। বসে বসে কাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছে, আর এটা-সেটা গল্প করছে।

বাঁধের উপর তারা আনমনে বসে। দুদিকে দীর্ঘ বাঁধ নদীর গা বেয়ে চলে গেছে। এই সেদিনও বাঁধ সবুজ নোনাঘাসে ঢাকা ছিল। ফাগুনের পর চোতের রোদে সেই সবুজ ঘাস কালসিটে হয়ে যেন মরে পড়ে আছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে মাটি ফেটে সাদা নোনা ফুটে উঠেছে। ঝলসানো রোদে চক্‌চক্‌ করছে।

ওদের পেছন দিকে ফাঁকা দুরন্ত মাঠ। সেদিনও সোনার ফসলে ভরে গিয়েছিল। আজ খাঁখাঁ করছে। ধান কেটে নিয়ে যাবার পর খড়ের গোছা সারা মাঠ ছেয়ে ছিল। গাঁয়ের লোকেরা আগুন দিয়ে সে সব পুড়িয়ে মাঠ যেন কালো করে দিয়েছে। এই ছাই হয়তো আগামী সনে খুলনা জেলার এই আবাদ অঞ্চলে সোনা ফলাবে, কিন্তু আজ বাতাসের সঙ্গে উড়ে উড়ে খাঁখাঁ রোদকে আরও রুক্ষ করে তুলেছে।

সামনেই নদী। নোনাজলের নদী। তারপরেই বন। সুন্দরবন। গাঢ় সবুজ বন। চোতের রোদকে উপেক্ষা করেই যেন ঝরা-পাতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন সবুজ পাতায় সে আরও সবুজ হয়ে উঠেছে।

আছের আর সোনা বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল। কেউ শুনবার নেই। যেদিকে তাকাও কোথাও কোনো জনমানব নেই। দূরে ওদের পাড়ায় দু'একজন কাজকর্ম করছে। তারই এক-আধটু যা খট্‌খট্ শব্দ। কেওড়াগাছের উপর-ডালে দুটি বাঁদর অলসভরে এ-ওর পিঠ খুঁটছে।

আছের আশ্চর্য হয়েই বলল,—তুই কি বললি ?

সোনা সোৎসাহে বলল,—কেন ? আমি বুঝি বললাম না! বললাম,—তোমাদের দেশে রেলগাড়ি আছে, আমার দেশে নৌকো আছে, বড় বড় পাল দেওয়া। তোমার দেশে বড় খেলার মাঠ আছে, আমার দেশে তার চেয়েও ঢের বড় মাঠ আছে—এপার-ওপার দেখা যায় না।

আছের প্রায় ধমক্ দিয়ে উঠল,—কেন, বলতে পারলি না—আমার দেশে সুন্দরবন আছে!

—দূর বোকা! বাদার কথা কি বলার কথা!

সোনা গিয়েছিল তার বা'জানের সঙ্গে খুলনায়। ওদের নায়েবের বাড়ি খুলনা শহরে। খুলনার কথা বলতে বলতে নায়েবের ছেলের সঙ্গে যে-সব গল্প হয়েছিল তার কথা উঠে যায়।

একটু থেমেই আছের বলল,—কেন ? তুই বুঝি বলতে পারলি না বাঘের কথা ? আমার দেশে কত বাঘ আছে।

—বাঘ! বাঘ তো কোনোদিন দেখিনি! কী করে বলব ?

—না, উনি ছাখেননি। না দেখেছিস তো কি হয়েছে! বানিয়ে তো বলতে পারতিস্। এ—ই এ—ত বড় মুখ, গোল গোল চোখ। এত বড় হাঁ করে গক্ করে কামড়ে দেয়! এক এক থাবায় আঠারো মানুষের বল!......

বলতে বলতে আছের তন্ময় হয়ে যায়। কাল্পনিক রেলগাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে যেন তাদের দেশের বাঘের গল্প করে শহরের ছেলেদের তাজ্জব বানিয়ে দিচ্ছে।

আছের সেই অবধি মনে মনে ভেবে রেখেছে,—যাবে সে একদিন চার জোয়ার আর চার ভাটির পথ ডিঙি বেয়ে খুলনা শহরে। রেলগাড়িও দেখবে, বাঘের গল্পও করবে। কিন্তু তার আগে তাকে একবার বাঘ দেখে নিতেই হবে।

বাঘ দেখে নিতে হবে বললেই কি হয়। সুন্দরবনে অনেক বাঘ আছে। অনেকে ছাখেও। কিন্তু যে ছাখে তাকে আর বন থেকে ফিরতে হয় না।

আছের ইতিমধ্যে অনেক বড় হয়ে গেছে। বেশ জোয়ানও হয়েছে। আছেরের বাবা নেই, মা-ও নেই। থাকে চাচার বাড়িতে। তাই ছেলেবেলা থেকেই তাকে খেটে খেতে হয়। কাজ করতেও সে ভালোবাসে। যে-কাজে গায়ের জোর লাগে, সে-কাজ পেলে তো ছুটে এগিয়ে যাবে। এত কাজ করে বলেই আছের আজকাল এমন জোয়ান হয়েছে।

আছেরের চাচা গরিব চাষি। তাই খেত-খামারের কাজে তার সংসার চলে না। প্রায়ই তাকে বনের ভেতরে যেতে হয়। কখনও মধু, কখনও কাঠ, কখনও বা গোলপাতা, আবার কখনও বা বন থেকে মাছ এনে বিক্রি করে তার সংসার খরচ চলে। অন্য কাজে না হলেও, কাঠ কাটবার সময় চাচা আছেরকে সঙ্গে নেবেই নেবে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি টেনে এনে ডিঙি বোঝাই করার কাজে জোয়ান আছের ওস্তাদ।

কত বছরই তো বনে গেল আছের। কিন্তু বাঘ আর তার দেখা হয় না। বনে অন্য কাজে গেলে সকালে গিয়ে বিকেলেই ফেরা যায়। কিন্তু কাঠ কাটতে গেলে অনেক রাত অনেক দিন বনেই কাটাতে হয়। চাচার বড় নৌকোও নেই, আর বড় নৌকো ভাড়া করার মতো টাকাও নেই। তার ডিঙি খুবই ছোট। তাহলেও এই ডিঙি ভর্তি

করবার মতো গাছের গুঁড়ি কাটতে কোনো কোনো সময় সাতদিনও বনে থাকতে হয়। তবুও এত বছরের মধ্যে আছের একবারও বাঘ দেখতে পায়নি।

বাঘ দেখতে না পেলে কি হবে, বাঘের হাঁক-ডাক সর্বদাই আছে। ঘরে রাত্রে শুয়ে শুয়ে বাঘের ডাক শোনে। বনে রাত্রে মাঝ-নদী থেকে তো আছের কত বাঘের ডাক শুনেছে। এই তো সেদিন এবাদুল মিঞার গোয়ালঘর থেকে একটা বাছুর নিয়ে গেল। গরুগুলি আর্তনাদ করে উঠলে সব বাড়ি থেকে ওরা টিন বাজিয়ে শব্দ করতে থাকে। তখন আছের ঘরের ফাঁক দিয়ে বাঘ দেখার চেষ্টা করেও কিছুই দেখতে পায়নি। পরদিন খুঁজে খুঁজে দেখে, বাড়ির নিকটেই নদীর ধারে বাছুরের শুধু চারখানা খুর পড়ে আছে।

সেবার বনে যাবার তোড়জোড় করে চাচা আছেরকে বলল,—চল্, কাঠ কেটে আনি। যাবি তো?

আছের বলল,—যাব তো! কিন্তু চাচা, তোমার শুধু বড়াই করা সার। একবারও তো বাঘ দেখাতে পারলে না!

—না, এবার তোকে বাঘ দেখাবই। ভালো ভালো কাঠ কাটতে হবে কিন্তু। পাঁচদিনের মধ্যে ডিঙি বোঝাই করলে তবে বাঘ দেখাব!

আছের এখন সংসারী। অনেক বড় হয়ে গেছে। তবু বাঘের নাম শুনলে সে যেন ছেলেমানুষের মতো হয়ে ওঠে। বাঘ দেখে সে খুলনায় গিয়ে বাঘের গল্প করবে—এই বাসনা আজও তার মনের মধ্যে চেপে বসে আছে।

গভীর সুন্দরবন। পাহাড়ী বনের মতো জংলা নয়। পরিষ্কার ঝকঝকে বন। নোনা মাটিতে যেন আগাছা বেশি জন্মাতে দেয় না। আবার পাহাড়ী বনের মতো গুরু-গম্ভীরও নয়। চারিদিকে নদী নালা বেয়ে স্রোতের ধারা তর্‌তর্‌ করে অনবরতই ছুটে চলেছে—কখনও বা জোয়ারের টানে, কখনও বা ভাটির টানে। যেন জীবন্ত এই বন।

অগুন্তি নদ ও নদী। বড় নদী ছেড়ে ছোট নদীতে পড়া যায়।

আবার ছোট নদী ছেড়ে খালে পড়া যায়। তারপরও খাল ছেড়ে 'শিষে' ধরে বনের গভীরতম স্থানে ডিঙি হাজির হবে। 'শিষে'গুলি খুবই সরু। মাত্র সাত-আট হাত চওড়া। জোয়ারের সময় কানায় কানায় জলে ভরে ওঠে, আবার ভাটির সময় ক্ষীণ ধারা নরম পলি-মাটির ওপর ঝিরঝির করে বয়ে যায়।

এমনি একটি শিষের মুখে আছেরের ডিঙি। দুপুর গড়িয়ে গেছে। শেষ গাছের গুঁড়ি ডিঙিতে তুলবার পরই চাচা বলল,—না, থাক্। আছের, আর দরকার নেই। আর ক'খানাই বা কাঠ ধরবে! তার জন্যে আরও একদিন দেরি করে লাভ কি! চল্, আজ চলে যাই।

—তা যা বলেছ চাচা! কিন্তু তুমি যে কথা দিয়েছিলে, তার কি হবে?

—কি বলেছিলাম?

—বাঃ, ভুলেই গিয়েছ! বললে বাঘ দেখাবে!

—হবে, হবে, চল্, যাবার পথে হবে। আজ পূর্ণিমা। বাঘ বন থেকে বনে ঘুরবেই ঘুরবে।

দু'জনে মিলে ঠিক করল, জোয়ারে বাড়ি ফিরবে। তবে জোয়ারের এখনও দেরি আছে। ফিরবার কথা ঠিক করলেও আছেরের মন খুঁত-খুঁত করে। এখনও তো দু'একখানা গুঁড়ি ডিঙিতে ধরবে। চাচাকে ডেকে বলল,—এক কাজ করো, তুমি গোছল করে ভাত চাপিয়ে দাও, আমি ততক্ষণে দেখি আরও কিছু কাঠ আনতে পারি কি না। কাছেই যাব, তোমার চিন্তা নেই।

চাচার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আছের কুড়ুল হাতে ডিঙি থেকে নেমে চলল। শিষেতে তখন জল নেই বললেই হয়। শিষে ধরেই এগিয়ে চলেছে। পরিখার মতো শিষেটি। বেশ গভীর। নিচুতে দাঁড়ালে ওপর থেকে আছেরের মাথা দেখা যায় কি যায় না। তলদেশ পাঁচ-ছ' হাত চওড়া। জল সামান্য থাকলে কি হবে, খাদে ভীষণ কাদা। পলিমাটির কাদা। চোরাবালির মতো এতে পা চেপে দিলে যেন কোমর

পর্যন্ত সড়্‌সড়্‌ করে দেবে যাবে। এঁটেল মাটি। একবার পা বসে গেলে যেন কামড়ে টেনে ধরে রাখে।

আছের এই কাদা এড়িয়ে পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে শিষে ধরে এগিয়ে চলেছে। কিছুদূর এগিয়ে একবার পিছন ফিরে দ্যাখে, চাচা কানে আঙুল দিয়ে ঝুপঝুপ করে খালের জলে ডুব দিচ্ছে। কামটের ভয়ে কয়েকটা ডুব দিয়েই নৌকোয় উঠে পড়ল।

শিষের ভেতর দাঁড়িয়ে আছের দু'পাশের গাছ দেখবার চেষ্টা করে। না! ভালো দেখা যায় না। সামনেই শিষে বাঁক নিয়েছে। তাও এবার পেরিয়ে গেল। না, এমন করে হয় না। উপরে উঠতেই হবে। নিশ্চয়ই এখানে ভালো খুঁটির গাছ পাওয়া যাবে।

পাড়ের খাড়াইতে বুক লাগিয়ে গাছের শিকড় ধরে হিঁচড়ে উপরে উঠেছে। উঠে গাছ দেখবে কি, নজরে পড়ল দুটি বড় বড় চোখ গাছের গুঁড়ির আড়ালে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। ওর দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এটা কী জন্তু? বাঘ? না! বাঘ হবে এই এত বড় জন্তু—চার পায়ে দাঁড়িয়ে ফুলতে থাকবে! হলদে কালো ডোরা। এ যে কালো-মতো জানোয়ার লম্বা হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে! বাঘ হলে তো বীর বিক্রমে গাঁগাঁ করে হেঁকে উঠবে। কৈ, এ তো নিঃশব্দে পড়ে আছে। না—এ বাঘ না!

কিন্তু কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—কী হিংস্র চাহনি! আছের যেন অবশ হয়ে আসছে। চিৎকার করে উঠল,—চাচা! এটা কী জন্তু! চা—চা, এটা কী ····

অবকাশ দেয় না সুন্দরবনের রয়্যালবেঙ্গল টাইগার। ছোট হলে কি হবে—হিংস্র গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল আছেরের উপর।

আত্মরক্ষার জন্য আছের কুড়ুল বাগিয়েছিল। কুড়ুলের আঘাত উপেক্ষা করেই বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুড়ুল ছিটকে পড়ে গেল। থাবা মারল বাঁ কাঁধ লক্ষ্য করে। আছের কাঁধ সরাবার চেষ্টা করতেই নখের আঁচড়ে বাঁ দিকের বাহুর কয়েক পরদা মাংস উঠে এল।

আছেরের ডাক শুনতে না শুনতেই বাঘের হুঙ্কারে চাচার ব্যাপার বুঝতে দেরি হয়নি। কোনও উপায় নেই। কি-ই বা সে করবে! করবার কিছু নেই তার। দ্রুত ডিঙির বাঁধন খুলে দিয়ে বড় নদীতে পড়তে চাইল। একবার শুধু বলল,—চেয়েছিলি বাঘ দেখতে! দেখলি তো বাঘ!

কিছুক্ষণ থেমে থেকে দাঁতে দাঁত কামড়িয়ে বলল,—সাধ মিটেছে! বাঘ দেখার সাধ মিটেছে!

বাঘ দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাবা মারতেই আছের পড়ে গেল। ঠিক শিষের কিনারায় ছিল। পড়ে গেল শিষের ভিতর। কোনমতে একটা গাছের শিকড় ধরে টাল সামলে দাঁড়িয়ে গেছে শিষের দেয়াল ঘেঁষে।

আছের পড়ে যেতেই বাঘ দু'পায়ে দাঁড়িয়ে টাল সামলাতে পারে না। পড়ল শিষের ভিতর গড়িয়ে পলিমাটির কাদায়। চটাং করে চার পায়ে লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে চার পা-ই দেবে গেল পলিমাটির চোরা কাদায়। যত জোর দেয়, ততই যেন দেবে যেতে থাকে।

আছের এবার হিংস্র হয়ে ওঠে। না, ওকে উঠতে দেওয়া হবে না! উঠলেই আমাকে ও শেষ করবে। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের উপর। শরীরের সমস্ত ওজন ও শক্তি দিয়ে চেপে ঠেসে দিতে লাগল কাদার ভিতর।

বাঘ তবু ঘাড় বাঁকিয়ে কামড়াতে চায়। বেপরোয়া হয়ে আছেরই ওর ঘাড়ের উপর হিংস্রভাবে কামড়ে ধরল। এ যেন আছেরের মরণ-কামড়। বাঘের চামড়া ও মাংস ভেদ করে যায় আছেরের হিংস্র দাঁত।

শিষেতে ঝিরঝির করে লোনা জল বয়ে চলেছে। ঘাড় পর্যন্ত দেবে গেছে বাঘের। লোনা জল চোখে নাকে ও মুখে ঢুকে দম আটকে আসতে থাকে। আছের পিঠের ওপর চড়ে আছে। এবার ওর মাথা চেপে দিতে থাকে জলে ও কাদায়।

আছের অনুভব করে, বাঘের পিঠে আর যেন জোর নেই। পিঠ দুমড়িয়ে শক্তি জড় করার আর চেষ্টা করে না। দম আটকে বাঘ মৃত।

তবু পিঠ ছেড়ে আছের উঠতে চায় না। বিশ্বাস নেই ওকে। লেজটা তখনও উঁচু হয়ে আছে কাদার উপর। লেজের কালো-হলদে ডোরা দেখে আছেরের হাসি পেল। চিৎকার করে বলল,—বাঘ!

আছেরের মত্ততা এবার থেমেছে। মনে পড়ল—চাচা! চিৎকার করে ডেকে উঠল,—চা-চা! চা-চা!···কোনও সাড়া নেই।

না। আর দেরি করলে হবে না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। লেজের মাথা শক্ত মুঠোয় ধরে লাফ দিল। বাঘের পিঠের ওপর দাঁড়িয়েই লাফ দিয়ে তীরের কাছে এল। লেজ ধরে উল্টো দিকে টানতে টানতে গোটা লাসটা টেনে তুলল।

জলের ওপর ভাসিয়ে নিয়ে লেজ ধরে টানতে টানতে খালের মুখে হাজির। চাচা নেই। চলল আবার খাল ধরে নদীর মুখে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ডাকে,—'চা-চা, চা-চা!' নিঃসঙ্গ নিঝুম বনে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে তার ডাক।

জোয়ার তখনও আসেনি। চাচা বড় নদীতে বেগোনে বেশি দূর এগুতে পারেনি। নদীর মুখে আসতে না আসতে ডিঙি দেখা গেল। আছেরের গলা শুনতে পেয়েই চাচা দ্রুত বেয়ে এল।

চাচা স্তম্ভিত। লজ্জায় সে যেন মাথা উঁচু করতে পারে না! লজ্জা ঢাকবার জন্য বলল,—তুই বেঁচে আছিস্! আয়, আয়,······বেঁচে আছিস্! একি বীভৎস চেহারা। ও কি,··· তোর মুখে কি?

এতক্ষণে আছেরের খেয়াল হলো তার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে বাঘের গায়ের লোম বিঁধে বিঁধে রয়েছে। ঠোঁট ফুলে গেছে। ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গোছা গোছা লোম বেরিয়ে আছে। বীভৎস চেহারা। মুখ ফুলে গেছে। সারা গায়ে মুখে ক্ষত-বিক্ষত চিহ্ন। বাঁ হাতের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। সেদিকে যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। লেজ ধরে টেনে বাঘের লাস খানিকটা উঁচু করে বলল,—চাচা ছাখো! দেখেছ! তুমি বাঘ দেখেছ? আমি বাঘ দেখেছি। তুমি রেলগাড়ী দেখেছ? আমি বাঘ দেখেছি!!

তিন

লোনা নদীর দেশ। থেকে থেকে নদীগুলি ফুলে ওঠে, আবার যেন তলিয়ে যায়। প্রতিদিন আসে দু'বার জোয়ার, দু'বার ভাটি। এই গোন ও বেগোন ঠেলে বাঙলার দক্ষিণে ভাটি অঞ্চলের মানুষকে দিন কাটাতে হয়। বিশ্রাম নেই তার। জোয়ার আর ভাটির তালে তালে তার কাজ করে যেতে হবে।

এই লোনা জলের জোয়ারের সঙ্গে চাষিদের লড়াই। নদীর মাটি কেটেই তারা নদীকে বেঁধে ফেলে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে। এ দেশে নদী যেমন অগুনতি, ভেড়িও তেমনি অফুরন্ত।

ভেড়ি ওঠে বটে, কিন্তু নদী শান্ত হয় না। কৃত্রিম বন্ধনকে ভাঙবার জন্য তার অবিরাম চেষ্টা। মাইলের পর মাইল দীর্ঘ ভেড়ি তুলবার জন্য চাষিদের দল বেঁধে কাজ করতে হয়। একজন দু'জন বা দশজনের সাধ্য নয়। শত শত হাতে একতালে এই মাটির প্রাচীর ওঠাতে হয়। তেমনি একে রক্ষা করাও একজন বা দু'জনের অসাধ্য। একবার কোথাও প্রাচীর ধ্বসে ফেলতে পারলে নদী যেন সেখানে প্রবল দুরন্ত হয়ে ওঠে। শত শত মানুষ সেখানে বুক পেতে না দাঁড়ালে ভেড়িকে রক্ষা করাই দায়।

খুলনা জেলার এই লোনা অঞ্চলে মছলন্দপুরের চাষিরাও একসাথে কাজ করতেই অভ্যস্ত। যে কাজেই তারা হাত দিক, দশে মিলে দল বেঁধে হাত দেবে—তা না দিয়েও উপায় নেই।

তবুও মছলন্দপুরের মাটিতে দশে মিলে মানুষ হয়েও ইসমাইল যেন কেমন অন্যরকম হয়ে উঠেছে। বড় হয়েও সে ভাব তার যায়নি।

সেদিন জয়নুদ্দির সঙ্গে কথা উঠতেই ইসমাইল বেশ জোর দিয়েই

বলল,—না, না, ওর মধ্যে আমি নেই!

জয়নুদ্দি তিরস্কার করে উঠল,—তোর জীবনে কিচ্ছু হবে না। কারও সঙ্গে হাত মেলাবি না, সে 'আত্মীয়-ব্রাদার' হলেও না। হবে না তোর কিছু!

জয়নুদ্দি, সম্পর্কে ইসমাইলের শ্বশুর। তাই ওরকম তাড়া লাগিয়ে কথা বলবার অধিকারও আছে। কথা উঠেছিল নৌকো গড়বার। মছলন্দপুরের সকল বাসিন্দাই ভাগ-চাষি। প্রজা বলতে কেউ নেই। কেউ বলতে পারবে না—এই ভিটে আমার ভিটে। পরের জমিতে লাঙল দিয়েই তারা পেটের অন্ন জোটায়। এক-ফসলী দেশ। তা'তে অবশ্য অভাবের কারণ ছিল না। সোনার ফসলের দেশ। ফসল ঠিক মতো হলে, যেন মাঠে সোনা ঢেলে দেয়।

কিন্তু তা'তে কি হবে! ভাগের ভাগ যা ঘরে আসবে তা'তে কারও মাত্র বছর খোরাক হয়, কারও হয় না। তাই লোনা দেশে চাষির স্বপ্ন—নৌকো। একখানা বড় নৌকো কোনমতে করতে পারলে আয়ের পথ খুলে যায়। নদীর দেশে নৌকোর চাহিদা লেগেই আছে।

জয়নুদ্দি এককালে নৌকো গড়ার মিস্ত্রি ছিল। সহজে হিসাব দিয়েই ইসমাইলকে বলল,—যদি করতে চাস্ পঞ্চাশ-মনী ডিঙি, তাহলে পড়বে পঁচাত্তর টাকা। আর যদি শখ থাকে একশ-মনী বাছাড়ীর, তাহলে পড়বে দু'শ্র টাকার ওপর।

—তা তো পড়বেই। তাই তো বলছি, এখন পারব না। নৌকো বড় না হলেও ভাড়া খাটিয়ে লাভ হয় না।

সুযোগ পেয়ে জয়নুদ্দি বলল,—সেই জন্যেই তো বলছিলাম, আয়, একসাথে দু'জনে মিলে একখানা বাছাড়ী বানাই। দু'জনে ভাগে চালাব।

এই কথারই উত্তরে সেদিন ইসমাইল অমন জোর দিয়ে প্রতিবাদ করে উঠেছিল।

ইসমাইলের দেহও যেমন বলিষ্ঠ, মনও তেমনি সাহসী। ফলে

তার নিজের প্রতি বিশ্বাস অটুট। ভাবে, সে একাই দাঁড়িয়ে যাবে। পয়সা আয় করে কেমনভাবে একলা বড় হতে হয়, তা সে দেখিয়ে দেবে। কারও সাহায্য সে চায় না। না, কোন কাজেও না।

মনে মনে ফন্দি করল, এখন থেকে সে মাঝে মাঝে কাঠ কেটে জমিয়ে রাখবে। তারপর দরকার হলে নিজেই নৌকো গড়বার কাজ শিখে নেবে।

লোনাদেশে কাঠ যোগাড় করা তেমন শক্ত নয়। মছলন্দপুর থেকে তু'বাঁকের মাথায় সুন্দরবন। এই গাঁয়ের লোকে নানা কাজে হামেশাই সুন্দরবনে যায়। সুন্দরবনের নিয়ম-কানুন ওরা জানে, বাঘের চাল-চলতির খবরও রাখে, আর বনের সম্পদ কোথায় কি আছে তারও হিসেব ওদের দখলে।

লোনাজলে লোনামাটির কাঠই মজবুত ও টেকসই। সুন্দরী কাঠের নৌকোই লোনা জলে টিকে থাকে। কিন্তু বনের এই অঞ্চলে সুন্দরী গাছ প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। এবার যেখানে বনের কাঠ কাটবার সরকারী অনুমতি মিলেছে, সে-ঘেরে কোথায় সুন্দরী গাছ আছে ইসমাইল তা ভালোভাবেই জানত।

কিছু সুন্দরী গাছ আনার তোড়জোড় চলল। সঙ্গে জয়নুদ্দি ও নিতাই মোড়ল। মাঝারি একখানা ডিঙি নিয়ে ক'দিনের মতো ওরা বনে প্রবেশ করল।

এ-নদী সে-নদী বেয়ে প্রবেশ করেছে গভীর বনে। কয়রা নদী থেকে কাশীর খাল ধরে আড়পাঙাশিয়া পড়ল। আড়পাঙাশিয়া বিরাট নদী। তারপর নাম না জানা খাল ও পাশ-খাল দিয়ে এসে হাজির গহন অরণ্যে।

এইবার যে খালে প্রবেশ করবে তারই তিন বাঁকের মাথায় ইসমাইলের জানা সুন্দরী গাছের 'লাট'।

খালের মুখে আসতেই ইসমাইল আচমকা বলে উঠল,—মোড়ল! ডিঙি ভেড়াও এখানে।

জয়নুদ্দি এই লাটের খবর জানত না। উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল,—এখানে কেন রে? এখানেই তোর সেই লাট নাকি?

কাটারি হাতে নিয়ে এক লাফে ডাঙায় উঠতে ইসমাইল উদ্যত। বলল,—দাঁড়াও, এখানে হবে কেন? ছাখো-না কি করি!

বলেই কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে একখানা সরু ডাল কেটে ফেলল। তারই মাথায় সাদা কাপড়ের ফালি ঝুলিয়ে, খালের ঠিক মুখে চরের ওপর পুঁতে দিল। চরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় সাদা নিশানা দুলে দুলে উড়তে লাগে।

মোড়ল অবাক। ভাবে ইসমাইলের এ আবার কি খেয়াল! কোনও বাঘের মন্তর জানে নাকি? হবেও বা। তা না, হয়তো······

ডিঙিতে উঠে ইসমাইল মোড়লকে বললে,—বুঝলে না? নাঃ, তুমি কিচ্ছু জানো না!

অভিজ্ঞ জয়নুদ্দি বিরক্ত হয়ে বলল,—ইসমাইল, বনেও তোর একবেঁড়েমি গেলো না। অমন করে ফাঁকি দিতে নেই। দশজনে মিলে-মিশে তো কাজ করতে হয়!

ইসমাইল শ্বশুরের বকুনি অনুমান করেই মোড়লের দিকে তাকিয়ে ছিল। বকুনিতে কান না দিয়ে মোড়লকে বুঝিয়ে বলল,—বুঝলে না মোড়ল! এখানে আর কেউ আসবে না। আর কেউ সন্ধান পাবে না এই সুন্দরী গাছের লাটের।

বনে-বাদাড়ে এ ধরনের নিশানা এক মর্মান্তিক সঙ্কেত। বনের কোনও লাটে বাঘে মানুষ নিলে, দলের বাকি লোকেরা ফিরবার সময় খালের মুখে এমনিধারা সঙ্কেত রেখে যায়। নতুন কোন দল এসে এই নিশানা দেখলে, আর সেই খালে প্রবেশ করে না।

খালের তিন বাঁকের মাথায় সুন্দরী গাছের সারি দেখতেই ওদের মন খুশিতে ভরে ওঠে। ইসমাইলের মুখে গর্বের হাসি। সেই-ই যেন এ সম্পদের মালিক। খুশি মনে তিনজনেই কাজে লেগে যায়।

ঝপ্‌ঝপ্‌ করে বেশ কতকগুলি গাছ কেটে ফেলল। তারপর

বেলা গড়াবার আগেই সবগুলি গাছের ডালপালা ছেঁটে গুঁড়ি বের করে নিল। গুঁড়িগুলি বেড়ে দুই হাত থেকে আড়াই হাত হবে। রক্তের মতো লাল সারবান কাঠ। ওদের আনন্দ ধরে না। আর কোন দলই এই কাঠের সন্ধান পাবে না।

সন্ধ্যার আগেই ডিঙি বোঝাই। তবু পুরো বোঝাই হয়নি। আরও একদিন লাগবে। তিন বাঁক পিছিয়ে এসে বড় খালের মুখে ডিঙি চাপিয়ে ওরা রাত কাটালো।

রাত কাটলো ভালোই—নিঃশব্দে, নির্ভাবনায়। ভোরের আলোর রেখা আকাশে দেখা দিতেই ডিঙি খুলে আবার চলল। পুরো জোয়ার। ইসমাইলের পোঁতা নিশানার খুঁটি স্রোতের টানে তরতর করে কাঁপছে। সাদা কাপড়খানা শিশিরে ভিজে চিমসে গেলেও ঠিকই ঝুলে আছে—বিদেশীর কাছে আতঙ্কের বাণী নিয়ে। এই সাদা নিশানা দেখলে কেউ এ-মুখো হবে না।

গাছ যা কাটবার, কাটা হয়ে গেছে। এইবার ছাটাই করে ডিঙি বোঝাই করার পালা। জয়নুদ্দি ডিঙিতে গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত। মোড়ল ও ইসমাইল দু'জনে মিলে একটা একটা করে গুঁড়ি ডিঙিতে নিয়ে তুলছে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। তাই কাজকে আর যেন ওদের কাজ বলে মনে হয় না। গুঁড়িগুলিও যেন হাল্কা লাগছে।

একটা গুঁড়ি দু'জনে দু'মাথায় ধরে সবে উঁচু করেছে। তারপর বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো কি যে হয়ে গেল, দু'জনের কোনও বোধ নেই। ব্যাঘ্রের বজ্রহুঙ্কার। সঙ্গে সঙ্গে অতবড় গুঁড়িখানা ইসমাইলের কাঁধ থেকে ছিটকে পড়ে গেল।

চোখ মেলে ইসমাইল ছাখে, সে মাটিতে পড়ে আছে, আর বাঘ মোড়লকে কামড়ে ধরে ঘাড় উঁচু করে বনের মধ্যে নিয়ে চলেছে। একবার দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় বাঁকিয়ে হিংস্র চাহনিতে ফিরে তাকাল। তাকাল যেন ইসমাইলের দিকেই।

হতভম্ব ইসমাইল যেন দেহের সর্বশক্তি জড়ো করে তড়িৎবেগে সামনের গাছটিতে হিঁচড়ে উপরে উঠল। হাত পা কাঁপছে, বুকে হৃৎকম্প, বাক্‌শক্তিও নেই। কোনমতে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে বসে রইল।

বাঘের অন্য কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কা'কেও তোয়াক্কা করবার নেই। এই রাজ্য যেন তারই রাজ্য। তবুও বোধহয় আহারের জন্য নিরিবিলি স্থান চাই। সামনেই মাত্র কয়েক হাত চওড়া একটি সরু খাল। স্বচ্ছন্দে একলাফে পার হলো। পাশে একটু ফাঁকা উঁচু ঢিবি। সেখানে মোড়লকে সামনে রেখে বসল। কামড় ছাড়তেই জিহ্বায় রক্তের আস্বাদ পেয়েই বোধহয় গাঁগাঁ করে উঠল। বেশ কয়েকবার। শিকার! তার লব্ধ শিকার! সামনেই পড়ে আছে। যেন খেলার ছলে একখানা থাবা দিয়ে মোড়লের পায়ে নাড়া দিল। মোড়ল সামান্য দুলে উঠল। জীবনের শেষ চিহ্ন বোধহয়! বাঘ চমকে উঠে যেমনভাবে বসেছিল তেমনিভাবেই এক লাফে দশ হাত পিছিয়ে গেল। আবার শিকারের অভিনয়। গুটি মেরে বসে লেজ নাড়তে থাকে। নিঃশব্দ। শব্দ হলে যে শিকার পালাবে! নির্মম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোড়লের উপর। আবার পিছনে লাফিয়ে আসে। আবার সেই অভিনয়!!

গাছের ডালে ইসমাইল। সেখান থেকে সবই স্পষ্ট দেখা যায়। এই দৃশ্য সে দেখতে চায় না, তবু সে ছাখে। শিউরে শিউরে উঠতে থাকে। কোনও শব্দ করবার সাহস নেই। শিকারমত্ত বাঘের সামনে তাহলে রক্ষা থাকবে না।

জয়নুদ্দি ডিঙিতেই ছিল। ব্যাঘ্র-হুঙ্কারের পর ভুল বুঝবার অবকাশ নেই। কারও কোনও সাড়া নেই।—দু'জনেই নিশ্চয় বনবিবির অপমান করেছিলি। তারই শাস্তি। তা না হলে এমন কখনও হয়! দু'জনেই গেলি!…ডিঙি খুলে জয়নুদ্দি দ্রুত বড় খালের মুখে চলল। খালের মুখে ইসমাইলের সেই পতাকা ঠিকই উড়ছে। উড়ুক,…এবার তো উড়বারই কথা!

বিমূঢ়ের মতো বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল মাঝ-নদীতে। কিন্তু কতক্ষণ আর একলা একলা অপেক্ষা করবে! ভাটির টান আসতেই তাকে ডিঙি ভাসিয়ে দিতে হলো আড়পাঙাশিয়া নদীর উদ্দেশে।

ইসমাইল এতক্ষণে সুস্থ হয়েছে। চিন্তাশক্তিও ফিরে এসেছে। কিন্তু তার দৃষ্টি একমাত্র বাঘের দিকেই। তার রক্ত-লেহন, মাংস-ভক্ষণ, ক্ষুধার তীব্রতা, আহারের পরিতৃপ্তি—সবই যেন ছবির মতো দেখল। তার আত্মরক্ষার কথা, পালাবার কথা যে মনে হয়নি, তা নয়। কিন্তু সে-পথ রুদ্ধ। সামান্য নড়াচড়া করলে, সামান্য শব্দ হলে রক্ষা নেই। শ্বশুরের কথাও মনে হয়েছে। আছে, সে নিশ্চয়ই ডিঙিতে আছে। আমাকে ফেলে সে নিশ্চয়ই যাবে না। কিন্তু যাই কি করে? ইসমাইলের চিন্তা থেমে যায়। দেখা যাক্ কি হয়!

বনে আঁধার নেমে আসে। দূরে ঢিবিতে বাঘকেও আর দেখা যায় না! এবার নিশ্চয় চলে যাবে। চলে গেছেও হয়তো! কিন্তু ইসমাইলের কোনও 'হয়তো' নিয়ে কিছু স্থির করবার সাহস নেই। যেমনটি বসে-ছিল, তেমনিভাবেই বসে রইল—সারারাত।

ভোরের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইসমাইল চারদিক তন্নতন্ন করে দ্যাখে। বাঘের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু ভরসা কি! আগের দিনও তো তারা প্রথমে বাঘের কোনও সাড়া পায়নি। না, দুঃসাহস করে লাভ নেই! আজও দেখি। একখানা না একখানা নৌকো, না-হয় ডিঙি এদিকে আসবেই। দলের পর দল কাঠ কাটতে আসার কথা। তাদের একদল নিশ্চয়ই এই খালে আসবেই! আল্লা! বড় নৌকোই আসে যেন! যেন সে-দলে দশজন থাকে। বড় একদলের আশায় আশায় ইসমাইলের দিন কেটে যায়। ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে প্রায় অবসন্ন।

হঠাৎ একসময় মনে পড়ল—তারই পোঁতা নিশানার কথা। চঞ্চল হয়ে উঠল। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মনের জ্বালা ও বেদনা সুন্দরী গাছের ডালে মাথা ঠুকে শান্ত করতে চাইল,—দশজনের দলই যেন আসে··· সে-নিশানা কি তিন দিনেও মাটির উপর ঢলে পড়েনি·····

সে-দিন, সে-রাতও কেটে গেল। বাঘের কোনও সাড়া নেই। অন্য কোনও জীবেরও যেন সাড়া ছিল না এই বনে। ভোর না হতেই একদল বাঁদর এ-গাছ থেকে ও-গাছ লাফিয়ে চলেছে। জীবনের সাড়া পেয়ে ইসমাইলের মনে যেন ভরসা এলো। বেপরোয়া হয়ে গাছ থেকে নেমেই প্রায় এক ছুটে বড় খালের মুখে এলো। তাড়াতাড়ি এক গাছে উঠে আবার প্রতীক্ষা।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায় উন্মুখ অপেক্ষায়। দূরে নদীর বাঁকে একখানা ডিঙির আভাষ মেলে। কারা যেন কাঠ বোঝাই করে ফিরছে। মৃতদেহে হঠাৎ সাড়া জাগবার মতো ইসমাইলের শ্রান্ত ক্লান্ত অঙ্গ চঞ্চল হয়ে উঠল। চিৎকারের পর চিৎকার। আপ্রাণে ডাক ছাড়ে।

ডিঙি ভিড়তেই ইসমাইল বলল,—দাঁড়াও, দাঁড়াও বড় মেঞা, আমি আসছি।

বলেই একখানা ডাল ভেঙে নিয়ে ছুটল। চরের ওপর তখনও তারই পোঁতা নিশানা নদীর হাওয়ায় দুলছিল। এক টানে তুলে ফেলল। তুলেই সেখানেই আবার হাতের ডালখানা পুঁতে দিল। একটু ইতস্ততঃ। তারপর এদিক ওদিক দু'বার তাকিয়ে গায়ের ফতুয়া খুলে ডালের মাথায় ঝুলিয়ে দিল। প্রায় দম বন্ধ করে পুরানো নিশানা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ডিঙিতে হাজির।

ডিঙির সবাই অবাক। বড় মেঞা ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল,—ও কি! ওরকম করলে কেন? কি হয়েছে?

—দাঁড়াও · বলছি···আগে বসতে দাও।

ডিঙিতে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে সব ঘটনা ইসমাইল বলল বটে। কিন্তু নিশানার কথা কিছুতেই ভাঙলো না। কোথায় যেন ওর বাধে।

মছলন্দপুরে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেছে। ইসমাইল নিজের ঘাটেই উঠল বটে, কিন্তু বাড়িতে না গিয়ে সোজা শ্বশুরের বাড়িতেই হাজির।

ইসমাইলের পুনর্জন্মে সকলেই হতবাক। গ্রামের সকলেই ধরে নিয়েছিল, বাঘের হাতেই প্রাণ দিয়েছে। জয়নুদ্দির আদ্যন্ত বিবরণ কারও বিশ্বাস না করার কারণ ছিল না। ইসমাইলকে এমনভাবে ফিরে পেয়ে সকলেই যেন একযোগে প্রশ্ন করল, –

—কি করে বাঁচলে ? দু'দিন কোথায় ছিলে ?

—দেখি, কোথায় ধরেছিল ?

—মোড়লের কি হলো ?

—দাঁড়াও,···বলছি···বলব,—বলেই ইসমাইল বেশ ব্যগ্রভাবে জয়নুদ্দির কাছে এসে চোখে মুখে আকুল আগ্রহ নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলল,—শ্বশুর, শ্বশুর ! তোমার কাছে নৌকোর কাঠ আছে ? আছে ? কাঠ আছে ?

—নৌকোর কাঠ ! তার মানে ?

—হ্যাঁ, নৌকোর কাঠ ! নৌকো বানাবার কাঠ !

—হ্যাঁ, আছে। কিন্তু কেন ? কি হয়েছে ?

চিন্তার অবকাশ দিল না জয়নুদ্দিকে ; ইসমাইল আবার প্রশ্ন করল,—আর কার কাছে আছে, বলতে পার ? কার আছে ?

জয়নুদ্দি মাথা চুলকিয়ে বলল,—হ্যাঁ, বোধহয় মোল্লাদের ঘরে কিছু আছে।

—আছে !!

ইসমাইলের বাঁ'হাতে তখনও সেই সাদা নিশানাখানা। হাঁটু ভেঙে সামনে ধরে দু'হাতের চাপে চড়্‌চড়্ করে নিশানা ভেঙে ফেলতে ফেলতে বলল,—হ্যাঁ শ্বশুর, আমি, তুমি, মোল্লারা, সবাই মিলে বাছাড়ী বানাব। মস্ত বড় নৌকো ! মছলন্দপুরের বাছাড়ী !!

চা র

সুন্দরবন। সবুজের সমারোহে সজীব এ-বন। এ-বনে জীবনের প্রবাহ অবিশ্রান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন। বয়োবৃদ্ধ হয়ে ঝরে পড়ার আগেই নবীনের সবুজ পত্রাভরণ যেমন তাকে অন্তরাল দেয়, তেমনি সেই আবরণ আপন গর্ভে নবীনের আগমনকে অলক্ষ্যে রাখে। জীবনের নিরবচ্ছিন্নতায় জন্ম ও মৃত্যু ঢাকা পড়ে।

শুধু বন নয়, বনের উপকূলবাসীদের নিকটেও জন্ম ও মৃত্যুর হিসেব জীবনের নিরবচ্ছিন্নতায় অবহেলিত। হাজার প্রশ্ন করেও জানা যাবে না, এদের জন্মের তারিখ বা বছর। জানবার আবশ্যকই বা কি! বনানীর এক কোণে জন্ম যখন পেয়েছে, জীবনের আপন তাগিদে একদিন যৌবনে উদ্বেলিত হয়ে উঠবেই তো! যেমন করে গোলপাতার ঝাড় সুন্দরবনের লবণাক্ত কর্দমে জন্মলাভ করেও জীবনের তাগিদে এঁকেবেঁকে মাথা চাড়া দিয়ে জীবনের আধিপত্য জানায় সবুজ পাতার বিস্তারে লোনা জলের উপর।

আবশ্যক নেই সত্য। কিন্তু আবশ্যক একদিন হয়েছিল ফারিদার

জীবনে। মর্মন্তুদভাবেই আবশ্যক হয়েছিল।

ফারিদা ফজলের বউ। না, তার চেয়েও বোধহয় বলা ভালো, ফজল ফারিদার মিন্‌সে।

সংসারের বড় বউ ফারিদাকে যা বলত তা একটুও বাড়াবাড়ি নয়। সে বলত,—সেই তোর যখন সাদি হয়েছিল, তখন তো ছিলি একরত্তি মেয়ে। তখন থেকেই তো দেখছি তোর রাশভারি, তোর দাপটি। আর কিছু না হোক, দু'একটা ছেলেপিলে হলেও ফজলের ওপর এমন দাপটি হয়তো মানাতো। আরে! মিন্‌সের ওপর অতো দাপটি করতে নেই!

ফারিদার দেহখানাও যেমন ভারিক্কিপানা, কথাবার্তায়ও তেমনি রাশভারি। উত্তরে বলত,—না হয় পোলার মা হইনি, তাই বলে কি সংসারটা গোল্লায় দেব। আচ্ছা বলো তো, আমাদের মতো গরিব ঘরে অমন করে গান-বাজনা নিয়ে মশগুল থাকলে কি চলে! না মুখে দুটো অন্ন জোটে!

—না হয় দুটো গান গাইলো, তাই বলে কি কোনও সাঁঝে তোমার হাঁড়িচড়া বন্ধ হয়েছে?

—বন্ধ হতে কতক্ষণ! এই তো, সেদিন ভোর সকালে একতারা নিয়ে গজল গান ধরেছে তো ধরেছেই। হাট-বার। জোয়ার ফুরিয়ে যায় যায়, সেদিকে কি আর হুশ ছিল!

ফজলের সেদিন হুশ ছিল না সত্যি। তার জন্যে বকাঝকা করে ফারিদা আত্মশ্রাদ্ধ করতে ছাড়েনি। কিন্তু আজ সেই কথার সূত্রে গজল গানের কথা উঠতেই ফারিদার দুর্বলতা ধরা পড়ে। হঠাৎ গলা নামিয়ে বড় বউকে বলল,—তা যাই বল না কেন, ফজলের গান শুনলে হুশ হারাতে হয়। তাই না!

এ-পাশ ও-পাশ মুখোমুখি দুই ঘর। বড় মেঞা রসুল ও ছোট মেঞা ফজলের। এক সংসার বলা চলে, তাহলেও দুই হাঁড়ি। বড় বউয়ের উস্কানিতেই এক উঠানে এরা দুই ঘর করেছে। সেদিন বড় বউ

উঠান পেরিয়ে ছোট মেঞার নিন্দাই শুনতে এসেছিল। কিন্তু ফারিদার গলায় ফজলের প্রতি দুর্বলতার ইঙ্গিত পেয়েই তখনকার মতো উঠান পেরিয়ে নিজের কাজে মন দিল।

* * *

সে-বছর ফজলের সংসারে দুর্দিন এলো। এলো কিন্তু ফজলের গান-পাগলামির জন্য নয়, এলো মিষ্টি ধানের দেশে নোনার দাপটে।

ভরা ভাদরের গাঙে লোনা পানি যেন থৈথৈ করে উঠল ভেড়ির মাথা অবধি। ঘোর অমাবস্যার খরতর টান। রাত্রের অন্ধকারে চকের মানুষ বেরিয়ে পড়েছে আলো ও কোদাল হাতে। ভেড়ি কোথাও ধ্বসে পড়লে, সবাইকে জড়ো হয়ে বুক পেতে ঠেকাতে হবে। একবার এই লোনা বিষ ঘেরে প্রবেশ করলে আর রক্ষা নেই। সে-বিষে এ চকের মানুষ জর্জরিত হবে সারা বছর।

পুবে হাঁওয়া দিল। ঝরঝর ধারায় বাদল নেমেছে। চাষিরা জড়সড়। ভেড়ি কোথাও ধ্বসে গেলে এরা হয়তো কোদাল ও হাতের ক্ষিপ্রতায় প্রতিরোধ করতে পারত। কিন্তু পুবে হাওয়ায় গাঙ থেকে-থেকে আরও ফুলে ওঠে। ভেড়ি ছাপিয়ে লোনা পানি সর্বত্র উপ্‌ছে পড়তে থাকে মাটির কৃত্রিম বাঁধনকে উপেক্ষা করে। এমন সর্বগ্রাসী আক্রমণকে চাষিরা সেদিনের মতো ঠেকাতে পারে না। ভাদ্রমাসের অমাবস্যার জোয়ারকে আবাদের মানুষ যমের মতো ভয় করে। ভয় নিরর্থকও নয়। সে-বছর হাহাকার দেখা দিল শুধু ফারিদার সংসারে নয়, চকের প্রতি সংসারে। ধানের বদলে চিটের বোঝাই উঠেছিল প্রতি খলেনে।

ফাগুন পেরিয়ে চোত মাস পড়েছে। কিন্তু আর তো সংসার চলে না। ফজল দাওয়ায় বসে একতারা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ফারিদা মুখ-ঝাড়া দিয়ে উঠল,—ওতেই কি পেট ভরবে?

ফজল অবাক হয়,—কেন? খালুই ভরে তো মাছ এনে দিলাম ভোর সকালে!

—মাছেই পেটের আগুন নিভবে ? ধানের মোড়াটা দেখেছ ? একবার ডালা উল্টে ছাখো ক'পালি ধান আর আছে ?

— কি করতে বলো আমাকে ?

—কি আর বলব ? আমার মুণ্ডুশ্রাদ্ধ করো! যাও-না বনে একবার। ছাখো-না কত লোক কত ভাবেই তো এটা-সেটা আয় করছে। তুমি যেতে পারো না ?

—বেশ, আমাকে তুমি বাঘের পেটে যেতে বলছ ?

—ছিঃ ! বাঘের পেটে যেতে বলব কেন ! কেন, যারা বনে উঠছে সবাই বুঝি বাঘের পেটে যাচ্ছে। ধারে কাছে বুঝি বাওয়ালি-ফকির নেই ! তাদের কাছ থেকে বুঝি কিছু মন্ত্র পড়ে নেওয়া যায় না !

—তা, বেশ !

—বেশ কি ? ঐ একতারা নিয়েই মজে থাকো। তা'তেই পেট পুরবে !

বাঘ সম্পর্কে ফজলের যতটা ভীতি না থাক, বনে ওঠা নিয়ে অনিচ্ছাই ছিল বড়। তাহলেও সে না গিয়ে পারে না।

তোড়জোড় চলে। গুইসাপ মারতে যাবে। গুইসাপের চামড়ার বেশ চড়া দাম। নানা শৌখিন জিনিস তৈরি হয় এতে। তারই সুযোগে আবাদের লোকে অবাধে গুইসাপ মারতে শুরু করে। সুন্দরবনে আছেও অজস্র। কিন্তু মারতে মারতে এমন অবস্থা যে, বনে সাপের উপদ্রব হয়ে ওঠে ভীষণ। গুইসাপ সাপ-ভক্ষক। এদের দাপটে বিষাক্ত সাপেরাও সংযত থাকে। অবশেষে গুইসাপ মারা সরকারি ভাবে বে-আইনী ঘোষিত হলো।

তারপর থেকে এই ব্যবসা চলেছে তলে তলে। তা'তে বিশেষ অসুবিধা হয়নি আবাদের মানুষের। ধরা পড়বার উপক্রম হলেই অতি সহজেই এরা গা ঢাকা দেয় বনের অগুনতি নদী, নালা ও খালের পথে।

তোড়জোড়ের বিশেষ তেমন কিছু নেই। তিনজন লোক চাই।

তিনজন যে হতেই হবে, এমন নয়। তবে তিনজন না হলে কোনও কাজে এরা বাদায় সহসা ওঠে না। তিনজন হলে তবে যেন একটা ছোটখাটো দল হয়। ফজলের সাথী হলো, দুর্লভ ও মাধো। দুর্লভের কিন্তু মাত্র একটা চোখ। তাহলেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে কারও চেয়ে কম নয়।

তোড়জোড়ের মধ্যে আর আছে ছোট একখানা ডিঙি ও কয়েকগাছি লাঠি। অন্য কোনও অস্ত্রের দরকার নেই। লাঠি পিঠিয়ে গুইসাপ মারতে হবে। অস্ত্রের আঘাত করলে চামড়ার দাম কমে যায়। ছোট, ধারাল দু'একখানা ছুরি অবশ্য চাই। বনে বসেই চামড়া খসিয়ে নিতে হবে। বে-আইনী সম্পদ তো,—বলা যায় না, পিটেল পুলিশের সামনে পড়লে ঝটপট সরাতে হতে পারে। তাছাড়া ছিল মাধোর হাতে একখানা কুড়ুল। ওটা হিসাবের মধ্যেই নয়, কুড়ুল ছাড়া বনে ওঠা চলে না।

বাউলে-ফকিরের কথা তিনজনে ভুলেই ছিল। ফারিদা জোর করে বেদকাশীর ফকিরের কাছে ফজলকে পাঠাল। সওয়া-পাঁচ আনা পয়সা লাগবে। তার ব্যবস্থা ফারিদা আগেই করে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত ফকির মন্ত্র পড়ে একখানা রুমাল দিয়ে বলল,—ফজল, এই রুমাল কাছে রাখিস্। তোদের কারও বিপদ হবে না। ভয় নেই। বনবিবি কোনও দিনই আমার ওপর গোঁসা করেনি।

গুইসাপ বা গোসাপ মারতে আর কোনও বিশেষ হাঙ্গামা নেই। বনের অতি গভীরে যেতে হয় না। যাবে আর আসবে। রোজ ভোরে নাস্তা খেয়ে বনে উঠবে, আর বেলা থাকতেই ফিরবে। তবে একটু পিটেল পুলিশের বোটের জন্য নজর রেখে রেখে বনে ঢুকতে বা বেরুতে হবে। এই যা।

তাই বলে বনের সর্বত্রই গোসাপ ঝাঁকে ঝাঁকে পাওয়া যায় না। সরু খাল হওয়া চাই। জোয়ারের জল অন্তত: ভালোভাবে খেলা চাই। যাতে জোয়ারের টানে মাছ এসে বোঝাই হতে পারে। এই মাছের

লোভেই গোসাপ এমনিধারা খালে জড়ো হয়। মাছ খেয়ে খেয়ে খালের চর বরাবর ঝোপ-ঝাড়ে আশ্রয় নেয় বা বিশ্রাম করে।

তেমনি এক খাল ধরে ওরা তিনজনে চলেছে নিয়ম মতো। মাধো জলের কিনারা ধরে চরের কাদা ভেঙে ভেঙে। নগ্নদেহ, মাত্র একখানা গামছা পরা। হাতে লাঠি। উপরে, ডাইনে ও বাঁয়ে,—সবুজের মেলা। নিচুতে, চরে ও জলে যেন পলিমাটির মসৃণ প্রলেপ। পেছন থেকে দেখলে দেখা যাবে, পিঠের পেশীগুলি সবল ও সজাগ। যে-কোনও মুহূর্তে যেন শক্তি জড়ো করতে উন্মুখ হয়ে আছে। ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছে ধাপে ধাপে। যেন আদিম মানুষের বন্য জীবনের এক ছবি।

গোসাপ থাকলে ঝোপে ঝাড়ে আছে। সাড়া পাওয়া মাত্র যেন সে জলে পড়তে না পারে। সেই মতলবেই মাধো একটু আগে আগে খালের জলকে আগল দিয়ে চলেছে।

ফজল ঝোপের এপাশ ধরে চলেছে। গুড়া গাছের ঝোপ। খাল ও বনের সীমানা যেন নির্দেশ করছে এই গুড়া গাছের ঝাড়। বেশি উঁচু নয়, বড়জোর মানুষের সমান। ঘন ঝাড়। এরই মাঝে গোসাপ লুকিয়ে আছে কিনা তাই দেখে দেখে চলতে হবে ফজলকে। ফজলের বেশও একই রকম। তবে একটু তফাৎ এই যা,—গলায় সেই মন্ত্রপড়া রুমাল জড়িয়ে বাঁধা। ফজলের রঙ অনেকটা ফর্সা। মুখ দেখলে বোঝা যায় না, কিন্তু পিঠ বেশ ফর্সা। বনে শিকারীর এ রঙ থাকলে মানায় না। সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে গোসাপ শিকার তো! অতো হিসাব নিকাশের আবশ্যক কি! নুইয়ে নুইয়ে গুড়া ঝাড়ের ভিতর দৃষ্টি দিয়ে চলেছে।

ফজলের পেছনে দুর্লভ। এক হাতে লাঠি. অন্য হাতে কুড়ুল। আঘাত হানবার জন্য তার অতো সচকিত ভাব নেই। তার সঙ্গে তো আর গোসাপের প্রথম দেখা হবে না।

তিনজনেই চুপচাপ। বন এমনিতেই মানুষকে নিঃসাড় করে দেয়।

তাঁতে আবার এরা যে-কাজে চলেছে, সে-কাজে নিশ্চুপ থাকতেই হবে। একটা গোসাপ মেরেই ক্ষান্ত হলে হবে না। একটাতে শ্রমের হিসাবেও পোষাবে না, ভাগের হিসাবেও না। ইতিমধ্যে ওরা দু-একটা গোসাপ পায়নি যে তা নয়। কিন্তু শিকার পেয়েও উল্লাস বা সোৎসাহ-ভাব দেখাতে যায়নি। তেমন কিছু করলে এ-খালে আর কোন গোসাপের দেখা পাওয়া ভার হতো। একে একে ঝুপঝাপ করে খালে পড়ে সবাই উধাও হয়ে যেতো। নির্বাক ছবির মতো ওরা যেমন কাজ-গুলি সেরে নিচ্ছে, তেমনি এগিয়েও চলেছে। লাঠির আঘাতও যখন করে, তখনও তা যেন নিঃশব্দেই করতে চায়।

কিন্তু এই খালধারে শুধু ওরা তিনজনেই তখন শিকার সন্ধানে মত্ত হয়ে ওঠেনি। শিকার যার পেশা, শিকার যার নেশা, শিকার ছাড়া যার জঠর-অগ্নি শান্ত করার আর কোনও পথ নেই—সেও মত্ত। মত্ত বটে, কিন্তু বাঘের এমন সংযত মত্ততার তুলনা নেই। তার সমস্ত তেজ, হিংসা, ক্রোধ, দুর্ধর্ষতা—সব-কিছুই সংযত করে রাখে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। এমন সংযত যে, বনের শুকনো পাতাও তার থাবায় মর্মরিত হয়ে ওঠে না।

ভিনদেশী এই ত্রয়ীকে বনের বাঘ দেখেছে অনেক আগেই। দেখেই ক্ষিপ্ত হয়নি। ক্ষিপ্ত হওয়াটা বাঘের ভান মাত্র। রোষ-কষায়িত হিংস্রমত্ত চেহারা বোধহয় ওর শিকারপূর্বের মুখোশ মাত্র। দেখার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত মনেই আড়াল নিয়েছে। হয়তো বেশ কিছুক্ষণ দেখে দেখে অনুমান করেছে, কোন্ পথে ওরা এগুবে। তারপর রাজ্য ঘুরে বনের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে এগিয়ে ওদের আগুপথে এক ঝোপের আড়ালে শক্তি জড়ো করে বসে আছে। সুযোগের অপেক্ষায় বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। ফজলের দল একবার একটা গোসাপ ঘায়েল করতে গিয়ে বেশ সময় নিয়েছিল। তবু শিকারমত্ত বাঘ উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শান্তমনে ওদের আসতে দিয়েছিল নিজের খপ্পরে।

পরের ঘটনা সহজ ও সরল। ফজল এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হলো, বুঝি বা গোসাপ সাড়া দিয়েছে। খালের দিকে মুখ করে উবু হয়ে দেখতে গেছে।

শিকারী এমন সুযোগ ছাড়বে কেন! তীর বেগে ছুটে এসে বিরাট মুখ-ব্যাদানে কামড়ে ধরল কোমর ও তলপেট। গোগো করে উঠেছে। এতো নিকটে বলেই হয়তো হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আবশ্যক হয়নি। উঁচু করে একটানে নিয়ে চলল। দুর্লভ পেছনেই। কুড়ুল হাতেই ছিল। দিশেহারার মতো ছুটে এসে দু'বাহু তুলে কুড়ুলের কোপ মারল। বাঘের ক্ষিপ্রতা দু'বাহু তুলে কুড়ুলের কোপের অবকাশ দেবে কেন! বেপরোয়াভাবে ফজলকে মুখে নিয়ে গোগো করতে করতে এগিয়ে গেল।

একটু এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল দুর্লভের দিকে। মুখে মৃত ফজল ঝুলছে। রোষকষায়িত দৃষ্টিতে ভীষণভাবে গলায় খাঁকার দিয়ে উঠল। বন যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে।

দুর্লভকে এমন ভয় দেখাবার কোনই আবশ্যক ছিল না। এমনিতেই সে দিশেহারা। বাঘ দৃষ্টির বাইরে যেতেই যেন নেশার ঘোরে মাটি থেকে কুড়ুলখানা তুলেই মাধোর কাছে ছুটে এলো। কুড়ুল হাতে রেখেই মাধোকে জড়িয়ে ধরেছে। কুড়ুলের ফলকে সুন্দরবনের পলিমাটির সঙ্গে বাঘের লেজের কয়েকগাছা লোম লেগে সাপটে আছে।

দুর্লভ ও মাধো পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে যেন খানিকটা ধাতস্থ। ফিরে এলো বন থেকে।

শুধু দু'জনকে ফিরতে দেখে ফারিদা আঁৎকে উঠেছে। কতবার প্রশ্ন করলো,—ফজল কই? ফজল কই? কোন উত্তর নেই। সামনে কুড়ুলখানা পড়ে আছে। বাঘের লোম দেখে চিনতে বাকি থাকে না। ডুকরে কেঁদে ফেটে পড়ল ফারিদা।

* * * *

বেদকাশীর ফকির ফারিদাকে দেখেই এগিয়ে এসে সম্ভাষণ জানায়,—কি সমাচার!

ফারিদা কথা বলবে কি, কেঁদেই অস্থির। কান্নার মাঝে একবার ফুলে ফুলে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল,—বলো ফকির! বলতে হবে তোমাকে! কিসে আমার এমন সর্বনাশ করলে? কেন? মন্ত্র! দাওনি তুমি মন্ত্র···বনবিবির এমন দয়া হলো কেন? কে—ন?

একটানা অভিযোগ, হয়তো বা অভিশাপ। ফকির ব্যথিত হৃদয় নিয়ে বলল,—না, মা! ফকির মন্ত্র ঠিকই দিয়েছে।

ফারিদার অভিশাপের ভয়ে নয়, বন ও বন্য জীবের প্রতি সমস্ত আস্থা ও ভরসা নিয়ে ফকির বলে চলে,—কি জানো মা? একটা দিন কোনও মন্তর খাটে না। ফজলের জন্মদিন কবে ছিল জানো? কারও জন্মদিনে আমরা জীবন রক্ষা করতে অপারগ।

ফারিদা এবার উচ্ছ্বাস-উদ্বেলিত হয়ে ওঠে,—কি বললে ফকির, ···জন্মদিন! জন্ম ও মৃত্যু!

ফারিদা প্রতিবাদ করবে কি! বনের মানুষেরা তো জন্ম ও মৃত্যুর হিসেব রাখে না।

শূন্য ঘরে ফারিদা ফিরে এলো। এতদিন যার নামেই বারে বারে ধিক্কার দিয়েছে, এবার সে-ই তার শূন্য জীবনে প্রধান আশ্রয় হলো

ফজলের একতারা!

ফারিদা অসাধ্য সাধন করেছে। সাঁঝের বেলায় ভেড়ির ওপর দাঁড়ালে শোনা যাবে, ফারিদার অন্ধকার ঘর থেকে ভেসে আসা একতারার টুং টাং টুং গজলের সুর। আরও কান পেতে থাকলে নিশ্চয় শোনা যাবে—নদীর ওপারের শূন্য বন থেকে সে-সুরের প্রতিধ্বনি··· টুং টাং টুং।

পাঁচ

জাত-শিকারীর ধরনই আলাদা। দশ মিনিটের আলাপেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, ফটিকের গায়ে জাত-শিকারীর রক্ত নেই। হরিণ ছ'চারটা বা বাঘ ছ'একটা মারেনি যে তা নয়। কিন্তু তার গল্প এমনভাবে বলবে, মনে হবে বুঝি-বা সে এইমাত্র শিকার করে বাদা থেকে আবাদে এসেছে। তার সাহসের স্বীকৃতি তখন তখনই না দিলে যেন নয়।

বক্‌স গাজির প্রায় মুখের সামনে এক হাতের বুড়ো আঙুলের পর আর এক হাতের আঙুল রেখে বলল,—বন্দুকের হিসনে ঠিক এক বিঘত আট আঙুলের মাপে রেখেছি। আমার কড়ে আঙুল একটু ছোট কিনা, তাই সাড়ে-আঠারো আঙুল মাপ দিয়েছি। যাছকে কলে পড়তেই হবে।

বক্‌স গাজির জামাই ফটিক। ও-বছর যখন সাদি হয় বক্‌স গাজির ইচ্ছে ছিল, ফটিককে ঘর-জামাই করে রাখবে। ঘর-জামাই করে রাখবার ক্ষমতাও ছিল গাজির। সুন্দরবনের রায়মঙ্গলের কাছাকাছি বাড়ি। এ-আবাদে বিপদেরও যেমন অন্ত নেই, তেমনি ফসলেরও যেন শেষ নেই। গাজি বছর বছর অঢেল সোনার ফসল ফলায়। তাহলে কি হবে, ফটিককে বশ মানানো দায়। ফটিক কোথাও বশ মানতে চায় না—বাদায়ও না, আবাদেও না। অন্ততঃ মুখে তো নয়ই।

ফটিক শ্বশুরবাড়ি এসেছিল সাবুদ খেতে। শিকারী জামাই। টাটকা হরিণের মাংস যদি না খাওয়ালো, তবে সে কেমন সুন্দরবনের জামাই! আর কেমনই বা শিকারী! বিশেষ করে যখন শ্বশুরের ঘরে টোটা বন্দুক বর্তমান। ঠিক হয়েই ছিল, আজ সকালে বনে হরিণ-শিকার করতে উঠবে। কিন্তু বাদ সেধেছে কাল রাত্রের বাঘের ডাক।

রাত্রে বাঘ এমন ডাক ডেকেছে যে, সবাই তখন জেগে পড়ে। সুন্দরবনে বাঘের ডাক মেঘলা আকাশে বাজ পড়ার শব্দের মতো। দু'তিন মাইল দূরে হলেও মনে হবে অতি সন্নিকটে।

ফটিক বলল,—ছাখো শ্বশুর, রায়মঙ্গল বাঘের তো বড় সাহস। 'মানষেলয়ের' এত কাছে এসে হাঁক দিচ্ছে। না, কাল আর হরিণ এ-মুল্লুকে মিলবে না।

কথার পিঠে কথা বলার ঝোঁক নিয়ে হাল্কাভাবেই বকুস বলল, --তা'তে আর কি হবে! হরিণ না হয় না হবে, বাঘ তো আছেই।

কাল হলো এইখানেই। ফটিক ঝমাৎ করে বলল,—দেখা যাক্।

সেই সূত্রেই ফটিক আজ বিকালে বন থেকে ফিরে এসে কল পাতার কথা বলছিল। বাঘ যখন রাত্রে সঙ্গিনী খুঁজবার মতলবে ডাকতে ডাকতে এক বন থেকে আরেক বনে যায়, তখন তারা ঠিক সেই পথেই ফিরবে। একটুও এদিক ওদিক যাবে না। সাধারণতঃ পরের দিনই রাত্রে ফিরে আসে। মাপের হিসাব ঠিক থাকলে কল পাতা খুবই সহজ। বাঘের পথে কালো সুতোর টানা দিতে হয়। বন্দুকের তোলা ঘোড়ার সঙ্গে এই সুতো বাঁধা থাকে। ছোট তেকাঠার উপর আঠারো আঙুল উঁচু করে ঠিক মতো বন্দুকের নল বসাতে পারলে, চোট্ হবে অনিবার্য। হৃদ্‌পিণ্ডের কাছাকাছি গুলি লাগবে এবং প্রায়ই তা মোক্ষম হয়।

বন থেকে আসা অবধি বাড়ির সবাই কান খাড়া করে আছে। বনের মাইল খানেকের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ হলে, সে রাত্রেই হোক, আর দিনে হোক, স্পষ্ট শোনা যাবে। সুন্দরবন যেমন নিঝুম, তার কোলের আবাদও তেমনি নিরালা। সামান্য শব্দ-তরঙ্গ ভেসে ভেসে বহুদূর চলে যায়।

কান খাড়া করে ছিল না শুধু বাড়ির মেয়েরা। একে তো তা'রা সাংসারিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, তার উপর তা'রা বন ও বনবিবি নিয়ে বেশি মাতামাতি পছন্দই করে না।

রাত্রি গভীর হতে আবাদে বেশি সময় লাগে না। এক অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস ছাড়া, আবাদের মানুষ সন্ধ্যা হতেই বিছানা নেয়। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের কথা অবশ্য আলাদা। ঘরে ঘরে পাকা ধানের গন্ধে তখন এরা পাগল হয়ে ওঠে।

রাত্রির প্রথম প্রহর পার হয়ে যায় দেখে ফটিকের বউ এসে বললে, —কি গো, বিছানা নেবার নাম নেই যে ?

ফটিক খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে,—দাঁড়াও বন্দুকের আওয়াজ হলো বলে।

—রাখো তোমাদের সাহসের কথা! বনে কল পেতে বাড়ি এসে হুড়কো লাগিয়ে সলা চলেছে!

—দেখি তোমার কেমন সাহস! দিনে দিনে একদিন বনে যাও দিকি!

—আর তুমি বুঝি সাহসের বড়াই করে বেড়াও না! অতো বড়াই ভালো না!

—সাহস আছে বলেই তো বড়াই করি। বড়াই করতে গিয়ে বনে মরলে তো, কবর দিতে তোমায় ডাকব না!

—না-হয় না ডেকো! এখন সবাই ঘুমোও তো!

সত্যি সত্যি সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই বনের নির্জনতা মানুষকে সহজেই অবসন্ন করে আনে। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে বন্দুকের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা গেল। ফটিকের বউ-ই প্রথম শুনতে পায়। শুনতে পেয়ে সবাইকে ডাকাডাকি করে তুলল। শুনতে পেলেও তখন তখনই করার কিছু ছিল না। শুভ বা অশুভ সংবাদ জানাবার তাগিদেই ফটিকের বউ সবাইকে ডেকে তোলে।

বন্দুকের চোট্ বা বাঘ নিয়ে আবাদে অতি উৎসাহিত হবার কিছু নেই। হামেশাই অমন ঘটনা এখানে ঘটছেই। সকালে ফটিক ধীরে-সুস্থে নাস্তা খেয়ে বনে ওঠার জন্য তৈরি। ভাবছিল, সঙ্গী একজন থাকলে ভালোই হতো। মুখে অবশ্য কিছু বললে না।

ফটিকের মনের ভাব বুঝে নিয়ে বক্‌স গাজি কোনও মতামতের অপেক্ষা না রেখে বলল,—চল্ ফটিক, আমিও যাচ্ছি। বাঘ যা পড়বে তা'তো জানি! বন্দুকটা তো তাড়াতাড়ি ধুয়ে মুছে রাখতে হবে। সারারাত পানি ও নোনায় পড়ে আছে।

—তা যা বলেছ, ঠিকই। চলো যাই।

খাল পেরিয়ে ডিঙি চরে তুলে দু'জনে মিলে বনে উঠল। থম্‌থমে বন। বাঘের আনাগোনা-পথে কোনও জীবজন্তুরই পাত্তা পাওয়া যায় না। এক কুমির আর শুয়োর ছাড়া। সুন্দরবনের কুমিরকে উভচর বলা চলে। চরে উঠে রোদ পোহান ওদের বাতিক। তাছাড়া মাছের লোভে সামান্য জলা জায়গার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। দেখা সাক্ষাৎ প্রায়ই হলেও, বাঘ কিন্তু ওদের বিশেষ ঘাঁটাতে যায় না। বাঘেরও তো প্রাণের ভয় আছে। বনে প্রায় সম-শক্তিশালী জীবেরা অযথা রেষারেষি করতে যায় না। আর শুয়োর তো একগুঁয়ে ও নির্বোধ। হয়তো ঠিক নির্বোধ নয়, লুকোচুরি করে বেঁচে থাকার স্পৃহা ওদের কম। তাহলেও এ-যাত্রা শ্বশুর ও জামাই-এর সঙ্গে কোন কুমির বা শুয়োরের দেখা হয় না।

ওরা সোজাসুজি বন্দুকের ধারে এলো। বাঘ বা কোন জীবই ধারে কাছে পড়ে নেই। ঠিকই চোট্ হয়েছে। ফটিকের বউ মিথ্যা বলেনি। বন্দুকটা ছিটকে কাত হয়ে পড়ে আছে।

অন্যদিকে কোন দৃষ্টি না দিয়ে ফটিক তাড়াতাড়ি বন্দুকটা হাতে নিল। নতুন টোটা পুরে সাবধানির মতো নলটা ঝুলিয়ে দিল মাটির দিকে।

ফটিক বন্দুকের তদারকেই ব্যস্ত; কল পেতেছিল, কলের ফাঁদে বাঘ পড়েনি। সুন্দরবনের বাঘ এক গুলিতে বহুসময় ঘায়েল হয় না। একবারে ঘায়েল না হলে, দ্বিতীয়বার তখন তখনই তাকে পাওয়া দুরূহ। কিন্তু সুন্দরবন সর্বত্র এক হলেও, সুন্দরবনের বাঘ সব এক নয়। রায়মঙ্গলের বাঘের কথা ফটিকের অজানা।

ফটিকের অজানা থাকতে পারে, কিন্তু বক্‌স গাজি বাঘ শিকারী না হলেও, রায়মঙ্গলের উপকূলবাসী। বাঘ না দেখে উদ্বেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সরে পড়তে চায়। এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব। বাঘ যে এসেছিল তা তার পদচিহ্নেই স্পষ্ট। বক্‌স নাক বড় করে গন্ধে হদিশ পাবার দু'একবার চেষ্টা করল বৃথাই।

এমন অবস্থায় বনে কথা বলার উপায় থাকে না। মানাও আছে। বক্‌স আকারে ইঙ্গিতে ফটিককে কাছে এনে সরে পড়বার জন্য প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। কোন্ দিকে বা কোন্ পথে যাবে তাও বিশেষ চিন্তা না করে এগিয়ে চলল। চিন্তার অবকাশই বা কোথায়!

বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। সহসা দু'জনেই শিহরিত হয়ে ওঠে। বাঘের পথ ধরেই ওরা এগিয়ে চলেছে! দুই জোড়া চোখ বাঘের পদচিহ্ন ও রক্তচিহ্নের ওপর। দাঁড়িয়ে পড়ল। এগুবে না পিছুবে? এগুলে বাঘের মুখোমুখি পড়বে। গুলিবিদ্ধ হিংস্রতম জীব এমন স্পর্ধার প্রতিশোধ নিতে এতটুকুও দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। পিছু হটলেও রক্ষা নেই। আর যারই হোক, পলাতকের বাঘের হাতে নিস্তার নেই।

এমন দোটানায় পথ কেটে বেরুবার পন্থা সুন্দরবনের দক্ষ শিকারীরা জানে। কিন্তু ফটিক সে-দক্ষতা আজও অর্জন করেনি। না করলেও বড়াই করতে সে ছাড়বে কেন? কিন্তু এখন বড়াই তো মুখে নয়, কাজে দেখাতে হবে। শ্বশুরের সামনে জামাই হয়ে কে-ই বা পরাজয় মানতে চায়; ফটিক এগিয়ে চলল রক্ত-রঞ্জিত পথ ধরে। বনে বন্দুক যার হাতে সেই নেতা। স্বাভাবিকভাবেই বক্‌স ফটিকের অনুগামী হলো।

কিছুদূর যেতে দেখা গেল বাঘের খোঁচ ঠিকই আছে, রক্তচিহ্ন আর নেই। কিসের ইঙ্গিত, আর কী-ই বা এর মানে—তা ভাববার অবস্থা এদের কি আর আছে! সামনেই বড় খালের ফাঁকা আলো – তা'তেই দু'জনে মশগুল। আর কিছু না হোক, সরে পড়বার অবকাশ হয়তো মিলবে।

মেলে না সে অবকাশ। বাঘ কলে ঠিকই আহত হয়েছিল। যে-ভাবে গুলি লেগেছে তা'তে ঘায়েল হবারই কথা। তবে রায়মঙ্গলের বাঘ। তেজ ও জীবনীশক্তি বোধহয় এদের আলাদা। আহত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সামনে এক কেঁচকি বনের ঝাড়ে। আহত হলে বন্য জীব মাত্রই জলের ধারে আশ্রয় খোঁজে। এত হিসেব করবার ক্ষমতা থাকলে ফটিক নিশ্চয় এমুখো হতো না, বা বড় খালের ফাঁকা আলো দেখে এতটুকুও আশ্বস্ত হতো না।

বাঘের খোঁচ সোজা সামনের কেঁচকি ঝাড়ে এগিয়ে গেছে। ফটিকের ঝাড়ের দিকেই লক্ষ্য। বন্দুকের নলও সেদিকে এবার উদ্যত। ডান দিকে খানিকটা এগুতেই ঝাড়ের ভিতরটা সবটাই দৃষ্টিতে এলো। না, কিছুই নেই! ফাঁকা ঝাড়!

বাঁ দিকে খাল। ফটিক ঝাড় দেখতে পাঁচ-ছয় কদম ডাইনে গিয়েছিল। বক্স কিন্তু লাইন ছাড়েনি। এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। ফটিক ইঙ্গিত করল, সোজা খালের দিকে এগুতে। দু'জনেরই মুখ খালের দিকে। সামনে বক্স, পিছনে ফটিক। খালের চরে পৌছুবার জন্য দু'জনেরই মন উৎফুল্ল। তাড়াতাড়ি যেতে পারলেই হয়। আর কিছু না হোক, চরে দাঁড়িয়ে পেছন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে সামনে বন্দুক উদ্যত করা যাবে।

তা হয়তো যাবে। সামনে মাত্র পঁচিশ গজ। তারপরেই খালের বিস্তৃত চর। এইটুকু তো পথ। এক দমেই পৌছে যাওয়া যাবে। বনে আবার দৌড়ান মানা। ওরা হেঁটেই চলেছে; হেঁটে চললেও গতিবেগ প্রায় দৌড়বার সামিল।

তবে চুরি করে দৌড়তে তো নিষেধ নেই। অন্ততঃ এ-বনের রাজা বাঘের তো নয়। আহত বাঘ যে এই কেঁচকি ঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল তা অবধারিত। পদচিহ্ন তার সাক্ষী। মানুষের সাড়া পেতেই সজাগ হয়ে ওঠে। ক্ষত বা আঘাতের কথা ভুলে জিঘাংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বহুদূর বিস্তৃত গোলাকার পথে বেড় দিল। এতটা দীর্ঘ পথ সে

অতিক্রম করেছে তীরবেগে। হাঁটু ভেঙে-ভেঙে ঘাড় ও মাথা নিচু করে করে ছুটে চলেছে। সারা দেহটাকে যেন হাত ও পায়ের চার খুঁটির মধ্যে দাবিয়ে লম্বা করে দিয়েছে। যেন বাতাসের মধ্যে ডুব-সাঁতার কেটে চলেছে।

অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। ফাঁকা বনে এতটা বেড় না দিলে লুকোচুরি চলে না। প্রতিটি পদক্ষেপে নিশ্চয় সে ক্ষতের যন্ত্রণা অনুভব করেছিল। যন্ত্রণাই হয়তো অধিকতর ক্ষিপ্ত ও হিংসামত্ত হবার কারণ।

কিন্তু আর লুকোচুরি নয়। এবার আওতার মধ্যে। ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষ কয় গজ মাটি ছেড়ে শূন্যে ভর করে ফটিকের উপর পড়ল। হুঙ্কার, দন্ত-বিকৃতির বিকট চেহারা, নখ-বিস্তৃত বিশাল থাবার আঘাত,—কিছুরই আবশ্যক ছিল না ফটিককে ঘায়েল করতে। অতবড় দেহের ওজনের আঘাতই পিষ্ট হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট।

বক্স গাজির পক্ষে হতভম্ব হয়ে যাবারই কথা। বন্দুক তার হাতে নেই। কাজেই গোড়া থেকে আত্মরক্ষার চিন্তাই ছিল মনে। কেঁচকি বন পিছনে ফেলে এসেই দেখছিল, সামনের গরান গাছে উঠে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। গরান গাছ। তা হোক। আঁচড় খেয়েও ওঠা যাবে। ভাবনা তার শেষ না হতেই বজ্রনিনাদ। একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়েই বুকে আঁকড়ে সেই গাছটিতেই উঠে পড়ল। প্রথম ডাল হাতে পেতেই দ্বিতীয় ডালে উঠে পড়ল নিমেষে।

এতক্ষণ বাঘ কি করছে, সে খেয়াল গাজির ছিল না। পেছন ফিরে তাকাল। এমন দৃশ্যের জন্য সে-প্রস্তুত ছিল না। জামাই ধরাশায়ী! সামনে বাঘ। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন এখনই দৌড়ে আসতে পারে তীরের মতন। শক্ত লম্বা লেজটি উত্তোলিত। মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বমুখী লেজে শিহরন খেলছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার দিকেই। মুখে চাপা গর্জন।

বক্স গাজি দুটো শিষ-ডালের গোড়া শক্ত করে ধরে ঝাঁকানি

দিতে দিতে চিৎকার করল। বাঘকে ভয় দেখাতে চায়। প্রাণভয়ে ভীত পলাতক মূর্তিমান হিংস্রতম জীবকে ত্রস্ত করতে চায়!

বাঘ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফটিক একবার পা নাড়তেই বক্স যেন পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে আর ডালপালা ঝাঁকাতে লাগে।

ফটিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে। স্পষ্ট দেখা যায়, বন্দুকটা হাতের মুঠোয় ধরাই আছে। লব্ধ শিকার অমন ছটফট করেই থাকে। বাঘের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই একবার তাকিয়ে দেখল মাত্র। আবার নজর দিল গাজির দিকে। গাজির মতলব কি, তাই সে জানতে চায়।

ফটিকের কতটা জ্ঞান ছিল তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে ঝটিতে হাতের মুঠোয় বন্দুকের নল উঁচু হয়ে উঠল। বন্দুকের গোড়ালি ফটিকের পায়ের কাছে। মুহূর্ত মধ্যে বন্দুকে আওয়াজ হয়ে ওঠে। বাঘও লুটিয়ে পড়ে কাছেই।···কিন্তু ফটিক !!

বাঘ পড়তেই গাজি ডালপালা নাড়া বন্ধ করে ফটিককে আপ্রাণে নাম ধরে ডাকতে থাকে। কোনও সাড়া মেলে না। তবুও ডাকে। ডেকেই চলে। সামান্য একটু নড়াচড়ার পর ফটিক শেষবারের মতো এলিয়ে পড়ল।

গাজি অনেকক্ষণ গাছে চুপচাপ বসে। গাছ থেকে নামতেই তার সাহস হয় না। কিন্তু বেলা গড়িয়ে যায় দেখে শেষ পর্যন্ত চোখ-কান বুজে একদৌড়ে খালের চর ধরে পালিয়ে এলো।

গ্রামে সকলেই খবরটা পাবার জন্য উন্মুখ। গুলির আওয়াজ সকলের কানেই গেছে।

গাজিকে এবার ফটিকের মৃত্যুর খবর গাঁয়ে বলতে হবে। কেমন ভাবে কথা পাড়বে, তাই তার ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গে বাঘেরও মৃত্যু-খবর দিতে পারবে বলে মন অবশ্য খানিকটা হাল্কা।

কিন্তু যার হাল্কা হবার নয়, তার? ফটিকের বউ ডুকরে কেঁদে উঠল। প্রথম ধাক্কা কাটতেই অশ্রুসিক্ত ঠোঁট কামড়ে ধরে বলে উঠল, —বনে মরলে তো কবর দিতে তোমায় ডাকব না! ··বনে মরলে তো কবর দিতে তোমায় ডাকব না!!

এক-একবার আছড়ে পড়ে আর বুকফাটা চিৎকার করে,—ডাকব না! ··ডাকব না!

ঐ এক কথা বারবার বলতে বলতে পাগলের মতো সেও সবার সঙ্গে জোর করে ডিঙিতে উঠল বনে আসবার জন্য।

ছয়

যশোহর-খুলনার এক সেকেলে মা। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সামনে একটু দূরে কেরোসিনের ডিবে। আলো যতটা দিচ্ছে তার চেয়েও কালো ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করছে দ্বিগুণ। মায়ের দৃষ্টি আলো ডিঙিয়ে উপর দিকে। ঠিক দৃষ্টি নয়, তাকিয়ে আছেন। রাত-কানা, তাই কোন কিছু দেখবার চেষ্টা না করে মাঝে মাঝে পলক ফেলে তাকিয়ে আছেন। বিধবা মা। রাত্রে খাওয়ার বালাই নেই। জলাহার যা হবার তা সমাপন হয়ে গেছে। হামান-দিস্তা নিয়ে পান থেঁতিয়ে চলেছেন ঢবঢব করে ঢিমে তালে। মাঝে মাঝে তর্জনী দিয়ে দেখছেন, পান-শুপারি কতটা গুঁড়িয়ে মিশে গেছে। অল্প আলো হলেও দেখা যায়, আঙুলের ডগা বেশ লাল হয়ে এসেছে।

চোখের তেজ হারালেও কানের তেজ একটুও কমেনি। হুড়কোর একটু আওয়াজ হতেই আধা-ফোকলা মুখে বলে উঠলেন, কিরে মহেন্দির! পারলি কিছু করতে? কই, আওয়াজ-টাওয়াজ তো কিছু শুনতে পাইনি!

—না, মা! হলো না। কোন পাত্তাই মেলেনি।

—তোর আর হবে না। এতো বাঘ মারার শখ যখন, তখন তোর বাঘের পেটেই যেতে হবে একদিন!

—অভিশাপ দিচ্ছ তো! যাক্ বাঁচা গেল, তাহলে আমি আর বাঘের পেটে যাচ্ছি না। জানো তো, মা'র অভিশাপ কোনদিনই সত্যি হয় না।

– রাখ্ তোর ঢঙ্। নে, এখন বন্দুকটা রেখে হাত-পা ধুয়ে আয়। যা খাবিটাবি খেয়ে নে।—বলেই তাড়াতাড়ি শেষবারের মতো হামান-

দিস্তায় পান ছেঁচে হাতের তেলোয় গোটা করে তুলে নিলেন।

বাঘের কারবার রাতের অন্ধকারে। খাস বনের খবর হয়তো আলাদা, কিন্তু গ্রামে এলে বাঘ কেমন যেন বুঝে ফেলে, শত্রু তার চারদিকে। বেশি হাঁক-ডাকও করে না, শিকারও করে রাত্রের অন্ধকারে চুপিসাড়ে।

বাঘকে খুঁজে পাওয়াও দুরূহ। বিশেষ করে যশোর-খুলনার নওয়াপাড়া অঞ্চলে এবং আরও বিশেষ করে শ্রীধরপুর গ্রামে। খুবই পুরানো গ্রাম। এককালে সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। দালান-কোঠায়, রাস্তা-ঘাটে এ-অঞ্চল বোধহয় গম্‌গম্‌ করতো তখন। বার ভূঞার রাজ্য ও শাসন ভেঙে পড়ার পর থেকে ধীরে ধীরে শ্রীধরপুরের শ্রী যেন কোথায় উবে গেল। একদিকে যেমন বিলাসভোগী জমিদারদের বংশগুলি শরিক বিবাদে হলো ছিন্ন-ভিন্ন, তেমনি অন্যদিকে জীবিকার সন্ধানে ও প্রতিপত্তির লোভে গাঁয়ের লোকজন দেশছাড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

এ অঞ্চল বলতে গেলে এখন জঙ্গলাকীর্ণ। তার উপর আবার ভাঙা দালান কোঠা ধীরে ধীরে গাছ-আগাছায় ঢাকা পড়ে হয়ে উঠেছে বন্য জীবের নিভৃত আশ্রয়। এমন অঞ্চলে শিকারীর পক্ষে এককভাবে বাঘের মতো জীবকে সহজে খুঁজে পাওয়া দায়।

দায় হলেও মহেন্দ্র বসুর দায়ও কম নয়। শ্রীধরপুরে এ এক মজার মানুষ। এমন মজার মানুষের দেখা এককালে বাঙলা দেশে বহু গ্রামে মিলতো। এরা সাধুও না, আবার সংসারীও না। মা, ভাই, বোন, বৌদির সঙ্গেই সংসারে জড়িয়ে থাকে। দায়-দায়িত্বও পালন করে। কিন্তু বিয়ে-থা করে কখনও পুরো সংসারী হবে না। অকর্মণ্য নয়, বরং কর্মবীর বলা যেতে পারে। এমন কাজ নেই যা তারা লেগে পড়ে থেকে উদ্ধার করে না। বসন-ব্যসনে এরা সাধু। চরিত্রেও সাধু। সততার প্রতিমূর্তি বলা যেতে পারে। খালি পা, পরনে ধুতি আর গায়ে হয়তো বা ফতুয়া, না হয় সাধারণ কামিজ।

সাধু বটে, তবে বৈরাগীও নয়, বিবাগীও নয়। মাছ মাংস কোনটাতেই আপত্তি নেই। কিন্তু মানুষের সাথে ব্যবহারে বৈষ্ণব।

সাহস এদের প্রায় দুর্জয় বলা যেতে পারে। কোনও বিপদ আপদ এদের কাছে বিপদ আপদই নয়।

মহেন্দ্র তেমনি এক মানুষ। মায়ের চার সন্তান। মহেন্দ্র তৃতীয়। অন্যান্য ভাইরা অন্যত্র সচ্ছলতায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মা তাদের কারও সঙ্গে থাকেন না। 'মহেন্দির'ই তাঁর প্রিয়। মহেন্দ্রের সঙ্গে এই পোড়ো গ্রামে পড়ে থাকতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়, তবু তার সঙ্গেই থাকেন ও থাকবেনও।

দক্ষিণ বাঙলার এমন পোড়ো অঞ্চলে এক মহাআপদ বুনো শুয়োর। মহেন্দ্রের একটা বন্দুক আছে। এটা তার পৈত্রিক সম্পত্তি। বিলাতী বন্দুক, মনে হয় আজও যেন নতুন চক্‌চক্‌ করছে। মহেন্দ্রেরও যত্নের যেন সীমা নেই। এই বন্দুকের জন্য মহেন্দ্রের ঘাড়ে এক দায় এসে পড়েছে। আশপাশের গ্রামকে বুনো শুয়োরের দাপট থেকে রক্ষা করা। এ কাজে মহেন্দ্র দক্ষ।

কিন্তু এবার বাঘের উপদ্রব। অগতির গতি মহেন্দ্র। তার চেষ্টারও বিরাম নেই। মহেন্দ্রের ভয়-ভয় যে করে না, তা নয়। সুন্দরবনের কাছাকাছি যশোর-খুলনায় বাঘের কথা হলে, রয়্যালবেঙ্গল টাইগারের কথাই প্রথম মনে হয়। এ যাবৎ তার সঙ্গে দেখা না হলেও—গল্পে গুজবে, প্রবাদে ও কাহিনীতে এই জীবের ভীতিপ্রদ চেহারা যেন অন্য সবার মতো মহেন্দ্রেরও চোখের সামনে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনও হদিশ করা যায় না। অবশেষে মহেন্দ্রেরই বাড়ির পাশে গোপাল গোয়ালার একটা বাছুর নিয়েছে। লাশ পেতে বিশেষ দেরি হয় না। আম-কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে শনের খেত। প্রায় মাথা-উঁচু শন-খড়ের এক ঝোপের মাঝে পাওয়া গেল। সবটাই প্রায় খেয়ে ফেলেছে, খাদকের পুনরাগমনের আশা বৃথা। তা ছাড়া ধারে কাছে এমন গাছ নেই যে গাছাল শিকার করা যাবে।

তিন বিঘে জমি নিয়ে শনের খেত। তার পরেই খোলা মাঠ। খোলা মাঠ ঠিক নয়, ধানের খেত। শীতের শেষে এখন অবশ্য ফাঁকাই।

তবে কলাইগাছের আবরণে গাঢ় সবুজ রঙ। কলাইশাকের আস্তরণের উপর বাঘের পদচিহ্নের কোন ছাপ থাকার কথা না। ছিলও না। এই খেত পেরিয়ে বাঁশঝাড়। দীর্ঘ ও সজীব ঝাড়গুলি। সজীবতায় ও নমনীয়তায় বাঁশঝাড়কে বাঙলা দেশের সৌন্দর্যের প্রতীক বলা যেতে পারে। দেখতে নমনীয় হলেও চরিত্রে কিন্তু বড় রুক্ষ। অন্য কোনও গাছকে এর ধারে কাছে হতে দেয় না। কাজেই ঝাড়ের তলা ফাঁকা ও পরিষ্কার।

মহেন্দ্র প্রায় আনমনে বাঁশঝাড়ের তলায় এসেছে। নজর সামনের জঙ্গলের দিকে। এবার সে সতর্ক। গাঁয়ের অনেকেই পেছনে জটলা করছে এবং ভয়ে খানিকটা হৈ-হল্লাও করছে। মহেন্দ্র সতর্ক পদক্ষেপে এগুতে থাকে। সঙ্গে গোপালের ছেলে মাধো। মাধোর বয়স বছর ষোলো হবে। সাহসের চেয়ে মনের আবেগে মহেন্দ্রের সঙ্গ নিয়েছে। বাছুরটাকে সে বড় ভালোবাসত।

মহেন্দ্রের ঝোপের দিকে লক্ষ্য। আস্তে আস্তে একটা কেয়াফলের গাছের প্রায় নিচে এসে গেছে। মাধো সহসা ত্রাসে চিৎকার করে ওঠে,—মাথার 'পরে! ঐ যে!!

কেয়া গাছের ডালে। যেমন গায়ের ছাপ গোল গোল, তেমনি গোল গোল তার চোখ। চিতা বাঘ বা এদেশে যাকে বলে 'গুলো বাঘ'। মহেন্দ্র সচকিত হয়ে তাকাতেই দেখে, প্রায় লাফ দিয়ে পড়ার উপক্রম। হয়তো বা মহেন্দ্রকে আরেকটু এগুতে দেবার জন্য অপেক্ষা করছিল। লেজ শক্ত করেছে, গোটে-করা দুই থাবার উপর ভরও করেছে।

মহেন্দ্রের গুলি করতে কাল বিলম্ব হয় না। কেঁদো নিচে পড়ল। লাফ দিয়েই পড়ল যেন আলগোছে চার থাবায় ভর করে। কিন্তু তার পরেই ধরাশায়ী।

* * *

ঘরে ফিরে আসতেই মা অভ্যর্থনা জানালেন,—কিরে মহেন্দির! তাহলে এবার বাঘ-শিকারী হলি!

শুধু মা নয়, এ-অঞ্চলের সবাই মহেন্দ্রকে বাঘ শিকারীর সম্মান দিয়ে বসলো। মহেন্দ্র 'হ্যাঁ'-ও করেনা 'না'-ও করেনা। করবেই বা কি। 'না' করলে তো সবাই ধরে নেয় ওর বৈষ্ণব বিনয়। কিন্তু মহেন্দ্রের শাক্ত মনে খটকা লাগতে থাকে। কেঁদো মেরে বাঘ-শিকারীর পদবী নিতে বাধে। যত দিন যায় ততই মনে খোঁচা লাগে বেশি বেশি করে। সুন্দরবনের কাছাকাছি বাস করে কেঁদো মেরে বাঘ মারার বাগাড়ম্বর করা মানায় না। সুন্দরবনে একবার বাঘের দেখা পাবার জিদ ক্রমেই মনে জাগে।

জাগলে কি হবে, সুন্দরবনে যাবার লোভ বহুদিন মনে মনেই পুষতে হলো। সুন্দরবনে যাব বললেই যাওয়া হয় না। অনেক তোড়জোড় আবশ্যক। হাতে বেশ অবসর সময় চাই, নৌকো চাই, ভালো মাঝি-মাল্লা চাই, সুন্দরবনের অজস্র খাল-নালা ও নদ-নদীর জ্ঞান ও ধারণা চাই, আর সর্বোপরি বনের সঙ্গে পরিচিত—এর জীব-জন্তু, গাছ-গাছড়ার সঙ্গে পরিচিত—লোক থাকা চাই। এমন লতাও আছে এ-বনের ঝোপ ও ঝাড়ে যার পাতার রসে বিদেশী শিকারীকে অন্ধ হয়ে ফিরতে হয়েছে বন থেকে।

ভাগ্যক্রমে এক সুযোগ এলো কয়েক বছরের মধ্যেই। খুলনা-যশোহরের মধ্যবিত্তদের সংসার তখন দু'নৌকোয় পা দিত। একদিকে কলকাতা, অন্য দিকে আবাদ। শিক্ষাদীক্ষা, চাকুরি-বাকুরি করে সংসারে দাঁড়াতে হলে, কলকাতা ; আর জমির উপর নির্ভর করে বাঁচতে হলে, আবাদ।

এদেশের লোকের আবাদের লোনা মাটির প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার। সামান্য কিছু অর্থ যোগাতে পারলেই আবাদের দু'চার বিঘে জমি কিনবেই কিনবে। কিনবেই বা না কেন ! সোনার ফসলের দেশ। শীতের মরসুমে ভাটি অঞ্চলের নদী-নালায় এমন নৌকো দেখা যাবে না, যা সোনার ফসলের ভারে ডুবুডুবু হয়নি।

মহেন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রতুল। ওকালতি করে সবে নাম ডাক হয়েছে। দেখা হতেই প্রতুল উৎফুল্ল হয়ে বলল,—যাবি নাকি দক্ষিণে? একা একা যেতে হবে, ভালো লাগছে না!

মহেন্দ্র অনাসক্ত ভাব দেখিয়ে বলল,—কি হবে তোর সঙ্গে গিয়ে। জানি, তুই যাবি তোর জমির লোভে, আর আমার লাভের লাভ—ভাটো দেশের নোনাপানি খেয়ে দিন কাটাতে হবে!

—না রে। দশ বিঘে মতো জমি কিনবার সুযোগ পেয়েছি গুনোরিতে—গুনোরির আবাদ দাকোপেরও দক্ষিণে। বাদা তো বেশি দূর নয়। তুই তো আবার শিকারী! চল্ না!

—দাঁড়া, কি বললি? ঠিক বলছিস তো!—মহেন্দ্রের সুর পাল্টে গেছে।

—বা রে! ঠিক বলব না! গত সনেই প্রথম যাই। আবাদ যে এমন তা কি আর ধারণা ছিল। সে কী দুর্ভোগ! বাঘের হাঁকাহাঁকির চোটে অস্থির। সন্ধ্যা না হতেই দোর বন্ধ করে ঘরে থাকতে হতো।

কথাবার্তার আর বেশি আবশ্যক হয় না। অগ্রহায়ণের শেষাশেষি ওরা চাল-চিঁড়ে আর মশলাপাতি গুছিয়ে নিয়ে যাত্রা করল। চালের দেশে চলেছে, চাল বা চিঁড়ের বিশেষ আবশ্যক ছিল না। কিন্তু দক্ষিণের অমন সবল ও পুষ্ট চাল মিঠে পানির লোকের পেটে সহসা সহ্য হয় না।

দাকোপ পর্যন্ত স্টীমারে গেলেই চলতো। তারপর দাকোপের মতো বড় হাটে টাবুরে-নৌকো পেতে বিশেষ বেগ পেতে হতো না। কিন্তু দুই বন্ধুতে যাত্রা-পথকে দীর্ঘতর করার আনন্দে খুলনা থেকেই নৌকোয় যাত্রা করল।

এই সময়ে খুলনা থেকে আবাদে যাবার নৌকোরও অভাব হয় না। আবাদে যাবার নদী-পথগুলি শীতের মরশুমে যেন নৌকোতে

নৌকোতে ধূলপরিমাণ হয়ে ওঠে। ফসলের গন্ধে বুঝি পাখির দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে থাকে। এতো ফসল যে আবাদের লোকেরা তো কেটে ঘরে তুলতে অপারগ। খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল—চারিদিক থেকে দলে দলে ডিঙি-ডোঙায় করে এসে ধান কাটার কাজে যোগ দেয়। যে যে-ভাবেই আসুক, এক মাস গতর খাটালে ধানের আঁটিতে তাদের ডিঙি বোঝাই করে দিতে আবাদের লোকে কার্পণ্য করে না। কাজেই মাঝি-মাল্লা সবাই এ-সময় আবাদের নামে বলতে গেলে ডিঙির বাঁধন খুলেই থাকে।

ভৈরব, রূপসা, পশর ও চুনকুড়ির পথ ধরে ওরা দাকোপ এলো। সে'দিন দাকোপের হাট। আবশ্যক মতো কাঁচা সওদা কেনাকাটি করে নেয়।

কমপক্ষে পনেরো দিন তো গুনোরিতে থাকতে হবে। দক্ষিণে আরও ভাটিতে হাট নেই বললেই হয়। দাকোপেই সে-রাতের মতো বিশ্রাম করার কথা। কিন্তু শুক্লপক্ষের ষষ্ঠি, ভাটি শুরু হবে শেষ রাতে। বিশ্রামের বদলে ভাটির অপেক্ষায় ব্যগ্র মনে সময় কাটাতে হলো। এই ভাটি হাতছাড়া হলে, পরের ভাটিতে গুনোরি পৌঁছতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে। সন্ধ্যায় বনের ধারে কাছে কেউই আনাগোনা করতে চায় না, বিদেশীরা তো কেউ সাহসও করে না।

গুনোরি এসে গুছিয়ে-গাছিয়ে সড়গড় করে নিতে চার-পাঁচ দিন কেটে গেল। প্রতুল তো ধান কাটার কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। ক'দিনের মধ্যে ধান খলেনে উঠে এলো প্রায়। এর পর মাড়াইয়ের কাজ। মাড়াইয়ের আগে অবশ্য ধানের আঁটি রোদ খাইয়ে নিতে হবে। ক'দিন ধরে কুয়াশা পড়ছে। ফলে রোদ খাওয়াতেও কিছুদিন বেশি সময় লাগবে। এবারই অবসর। মহেন্দ্র উশখুশ করতে থাকে। কথাও পাড়ে। বনে শিকারের কথা। নবীন মোল্লার সাথে কথা

পাড়লে সে বলল,—কি শিকার ?

মহেন্দ্র থতমত খেয়ে বলল,– হরিণ শিকার।

এই ক'দিনেই যা দু'একটা বাঘের গল্প শুনেছে তাতে বাঘের কথা মুখে আনা যে বেয়াদবি, তা মহেন্দ্র বুঝে ফেলেছে।

নবীন মোল্লা ঠাট্টার সুর নিয়ে বলল,—তা হরিণ খুঁজতে খুঁজতে যদি বড় মেঞার সঙ্গে মোলাকাত হয়, সে আপনার ভাগ্যি!

এ-কথা বলেই আবার বলল,—তাই বলে বাঘের কথা কিন্তু মুখে আনতে যাবেন না!

নবীন মোল্লার এসব কথা বলার খানিকটা অধিকার ছিল। নিজে পুরো বাওয়ালি না হলেও অনেকবার বাওয়ালির সঙ্গে বাঘ সরিয়ে দিতে বনে ঘুরেছে; হরিণ শিকারও দু'চারটে করেছে।

ঠিকঠাক হলো বনের অনেক ভিতরে গিয়ে শিকার করতে হবে। তবে ডাঙায় নয়, ডিঙি করে বড় নদীর চরে চরে। উত্তরের 'বাবু শিকারী'কে নিয়ে বিপদে পড়তে চায় না নবীন মোল্লা। কন্‌কনে শীতের রাতের পর মিষ্টি রোদ নদীর চরে উপ্‌ছে পড়তেই দলে দলে হরিণ আসে রোদ পোহাতে।

এ-পন্থায় সুন্দরবনের হরিণের দেখা পাওয়া সহজ হলেও শিকার করা সহজ নয়। বড় নদীর মাঝ দরিয়া থেকে বেশ দেখা যাবে, ছোট বড় হরিণের দল চপল পায়ে ঘুরে ফিরে যেন চরের ওপর মাছের মতো সাঁতরে বেড়ায়। বন্দুকের পাল্লার বাইরে থাকলে ওরা নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার। কিন্তু ডিঙি একটু এগিয়ে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আনতে গেলেই চকিতে বনের আশ্রিত জীব বনের মাঝে কোথায় যেন উবে যাবে।

সেখের টেক্‌। দক্ষিণে কালীখাল। পুবে পশর, পশ্চিমে শিব্‌সা এবং উত্তরে সেখের খাল। চার বর্গ মাইল পরিমাণ স্থান। সুন্দরবন

দুর্গম। কিন্তু এই চত্বরটুকুর দুর্গমতার তুলনা নেই। ঐতিহাসিকদের অনুমান, এইখানেই রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর শিব্‌সা দুর্গ ও কালিকা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার চিহ্ন আজও বর্তমান। কোন কোন মন্দির তো আজও বনের আড়ালে মাথা উঁচু করে আছে।

পোড়ো-ঘরবাড়ি, আর সুন্দরী, গরান, গর্জন, ও গেঁয়ো বৃক্ষরাজি আর হেতাল, বলাসুন্দরী, গিলে লতা ও গোলপাতা—সকলে মিলে জড়াজড়ি করে যেন নিবিড়ভাবে দুরধিগম্য করেছে এই চত্বরকে। যেমন বাঘ, তেমনি হরিণ। খাদ্য ও খাদক কেমন করে এমন একত্রে বসবাস করে—সে এক বিচিত্র ব্যাপার।

ডিঙিতে মহেন্দ্র, প্রতুল, নবীন মোল্লা ও আরও দু'তিনজন। ভোর থাকতে যাত্রা করেছিল। সেখের খাল ছাড়িয়ে এতক্ষণ পশরে ভাটির টানে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। ডাইনে সেখের টেক্। সকালের এমন রৌদ্রস্নাত চরে হরিণের দেখা না পাওয়া আশ্চর্য। মাঝে মাঝে চরের কিনারায় দু'একটা বানরকে ঘাসের মুথো খুঁজে বেড়াতে দেখা গেল। কিন্তু হরিণের চিহ্ন মেলে না। নবীন মোল্লা বেশ বিব্রত। সে অতিশয় আশ্বাস দিয়েছিল সবাইকে।

পশর এখানে একটানা দক্ষিণে সাগর মুখে এগিয়ে গেছে। এপার ওপার প্রায় দেখা যায় না। এত বড় নদীতে একটু আধটু আঁকাবাঁকা ধরা দেয় না চোখে। তবু তীর ধরে এগুলে দেখা যাবে, উপকূল ভাগ করাতের মতো খাঁজকাটা। ছোট ছোট টেক্‌গুলি একের পর এক জলরাশির মাঝে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বার বার টেক্‌গুলি পেরুবার মুখে নবীন মোল্লা বন্দুক হাতে মহেন্দ্রকে সতর্ক করে দিচ্ছে। যেন এইবারই শিকার মিলবে। নতুন শিকারীর মতো মহেন্দ্রও বন্দুক কাঁধে নিয়ে বারবার সতর্কও হচ্ছে। কিন্তু বৃথা। সামনে আরেকটা টেক্। টেকের শেষ বিন্দুতে একক একটি কেওড়া গাছ। একা দাঁড়িয়েথাকলেও তার ঘন পাতার আবরণে বেশ আড়াল পড়েছে। নবীন মোল্লা আবারও সতর্ক করলো। গভীর

বনের এমন পরিবেশে কোনও সতর্ক বাণীকে অবজ্ঞা করা যে-কোনও লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। মহেন্দ্র তো দূরের কথা। কাঁধে তুলে ঘোড়ায় হাত দিয়েই আছে।

ডিঙির গলুই টেক্ বেড় দিতেই দেখে, শিকার ওদের সামনে। গলুই-এর সামান্য ছায়া চোখে পড়তেই সবে মাথা উঁচু করেছিল সমঝে নিতে। বন্য জীব মাত্রই বিপদের সংকেত পাওয়া মাত্র দৌড়ে পালায় না। মুহূর্তের জন্য একবার দেখে নিতে চায়, বিপদ তার কোন্ দিকে। তারপরই তড়িংগতি। হরিণ হলে তো সে-গতির তুলনা নেই।

মহেন্দ্র সে অবকাশ দিল না। মুহূর্তের মধ্যে ধূম্র উদ্গিরণ করে বন্দুক আওয়াজ করে উঠল। দীর্ঘকায় শিঙেল হরিণ টলতে টলতে বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

সঙ্গে সঙ্গেই নবীন মোল্লার উল্লাস,—সাবাস বাবু, সাবাস!

আর সবাই চুপচাপ। মোল্লা একটু পরেই বলে,—কিন্তু মুশকিলের কারবার হলো তো!

প্রতুল এতক্ষণে ভয়ে আড়ষ্ট গলায় সবাক হয়ে ওঠে,—কেন? মুশকিল আবার কি হলো?

—না, তেমন কিছু নয়। চরে পড়লেই ভালো ছিল। শিকার ঠিকই হয়েছে। ওকে ধারে কাছেই পড়তেই হবে। পড়েছেও ঠিক। তবে বনে তো একটু উঠতে হবে। তাই!

মহেন্দ্রের উৎসাহ এবার অদম্য। ওদের কথাবার্তার মধ্যেই নামবার তোড়জোড় করতে থাকে। হালের লোকটি স্বাভাবিকভাবেই চরে ডিঙি লাগাতেই মহেন্দ্র নেমেও পড়ল। নবীন মোল্লাও অনুগামী হয়ে চরে নেমেছে। নেমে একবার মহেন্দ্রের হাতে দোনলা বন্দুকটির দিকে তাকাল। ভয়ানক ইচ্ছা হলো, সে নিজেই বন্দুকটি হাতে করে বনে ঢোকে। লজ্জায় বন্দুকটি চাইতে পারল না। মৃত্যুর মুখোমুখি এমন ঘটনা ঘটে। শুধু বলল,—একটা তো খালি হয়েছে, ওটাতেও গুলি পুরে নিন বাবু!

মহেন্দ্র বন্দুকের নল ভেঙে গুলি পুরতে পুরতে নবীন মোল্লা হরিণের জায়গাটিতে এসে গেছে। অজস্র হরিণের পদচিহ্ন। তার মাঝে কোনটি কার বা কবেকার, তা ঠিক করা দুঃসাধ্য। মহেন্দ্র কাছে আসতেই আন্দাজে দু'জনে হরিণের পলায়ন পথ ধরল। সন্দেহভঞ্জন হতে সময় লাগে না। সামনেই তাজা রক্তের চিহ্ন।

অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। এতদূর আসতে হবে মোল্লা তা আগে ভাবতে পারেনি। কিন্তু এখন কি করা! পিছুতে সম্মানে বাধে, এগুতে শঙ্কা জাগে! সেখের টেক্, এ-টেক্‌কে বিশ্বাস নেই। তবু মহেন্দ্রের উৎসাহ মোল্লাকে যেন টেনে নিয়ে চলল। লব্ধ শিকারের প্রতি শিকারীর আকর্ষণ দুর্দমনীয়।

বেশিদূর আর এগুতে হলো না। কয়েক কদম এগিয়ে হোদো ঝাড়ের পাশ কাটালেই একেবারে মুখোমুখি। ত্রিশ হাতের মধ্যেই। অমন বিশালকায় বাঘের হিংস্র দৃষ্টির তীব্রতা আচম্বিতে স্তম্ভিত করে দেবে যে-কোন জীবকে। মহেন্দ্র আড়ষ্ট। নবীন মোল্লাও হতবাক্।

গোটা হরিণটার উপর চেপে বসে রক্ত পানে লিপ্ত ব্যাঘ্র চাপা গর্জন করে ওঠে। নিম্ন অধর বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। চাপা গর্জন ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। রোষকষায়িত কটাক্ষ। ভ্রূ দুটি যেন ওঠা নামা করতে থাকে। ললাটের কালো রেখার এই কম্পন দেখলেই মনে হবে, দুর্জয় শক্তি, বেগ ও ক্রোধকে যেন কোন-মতে রুদ্ধ করে রেখেছে মুহূর্তের জন্য।

নবীন মোল্লা মহেন্দ্রের কাছ থেকে কয়েক কদম পেছনে ও খানিকটা পাশে। মোল্লা হতবাক্ হলেও জ্ঞানহারা হয়নি। মহেন্দ্র বুঝি জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছে। সর্ব অঙ্গ নিশ্চল।

না, নিশ্চল হলেও ঢলে পড়ল না। মন তার সজাগ ছিল না, কি ঘটছে আর কি ঘটতে পারে—সে-বোধ মহেন্দ্র হারিয়ে ফেলেছে। শুধু কেমন করে সে যেন বন্দুকের নল উঁচিয়ে ধরল। উঁচিয়ে ধরতেই

বাঘের ক্ষিপ্ত গর্জন হঠাৎ স্তব্ধ। বাঘের গর্জন বুঝি-বা এতক্ষণে মোল্লা ও মহেন্দ্রের কাছে সহজ হয়ে এসেছিল। হিংস্র ও উগ্র চাহনির সামনে এই স্তব্ধতা এবার তার চেয়েও ভয়ংকর মনে হলো। বিস্ফোরণের পূর্বমুহূর্ত।

পলকের অবকাশ নেই। লেজ দিয়ে মাটিতে বাড়ি দিতেই মোল্লা সর্বদেহ কাঁপিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো,—মারো !!

মহেন্দ্র যেন চিৎকারের ধাক্কায় গুলি করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে ব্যাঘ্রহুংকার। শ্রীধরপুরের শুয়োর শিকারের অভ্যাস-মতো মহেন্দ্র কয়েক কদম পাশে সরে এলো। পাশে সরে আসবার অবকাশ কি করে পেলো, সে-হিসাব মিলবার নয়। বজ্র হুংকারের সঙ্গে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো মহেন্দ্রের পূর্বস্থানে। গুলির প্রত্যাঘাত কতটা লম্ফনকে ব্যাহত করেছিল তা অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

তবু বিশ্বাস নেই। কোন অবকাশ দিতেও নেই। মোল্লা চিৎকার করে উঠলো,—মারো,…গুলি মারো।

দ্বিতীয় বুলেট মাথা ভেদ করতে অতবড় দেহের সর্বস্পন্দন স্তিমিত।

বন্দুকের কুঁদো মাটিতে রেখে নলের ওপর হাত ভর করে মহেন্দ্র সন্ন্যাসীর মতো নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল। একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলল,—অভিশাপ।

* * *

নবীন মোল্লা খানিকটা হৈ-হল্লা করে মহেন্দ্রকে প্রায় টেনে নিয়ে এলো ডিঙির কাছে। চরের ওপর শীতের প্রশান্ত পশর নদীর হাওয়া চোখেমুখে লাগতেই মহেন্দ্র যেন ধাতস্থ হলো।

ডিঙির লোকেরা তো বিপদের ইঙ্গিত পেয়ে লগি তুলে এক

খোঁচায় ডিঙিকে স্রোতের টানে ফেলে দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল। ওদের দু'জনকে দেখতেই গলুই চরের ওপর আবার এগিয়ে দিয়ে প্রতুল সাগ্রহে প্রশ্ন করল,—কি রে মহেন্দির! ফিরে এসেছিস!

প্রশ্নের প্রতি খেয়াল না করে মহেন্দ্র স্বগত উক্তির মতো যেন বলল,—মায়ের অভিশাপ কখনও সত্য হয় না! তাই না!!

সাত
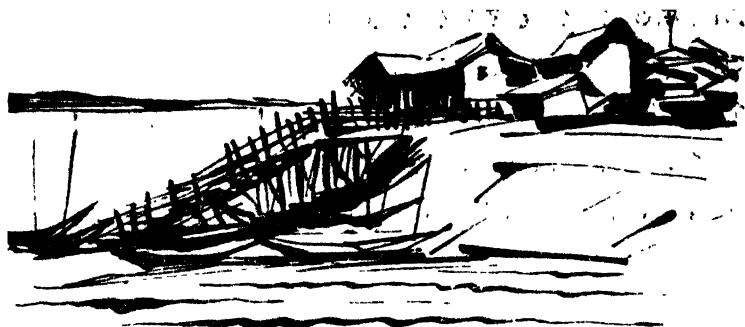
সুন্দরবন দুর্গম ও দুরধিগম্য। মিথ্যা কথা, এমন সুগম ও সহজ-অতিক্রম্য বন অন্য কোথাও মিলবে কিনা সন্দেহ। জলপথ ধরলে এ-বনের যে-কোন অংশের অন্তস্তলে পৌঁছান যাবে অতি সহজেই। স্থলপথ ধরলে নাতিদীর্ঘ স্পষ্ট গুঁড়িগুলি যেন আহ্বান করতে থাকে। এগিয়ে যাবার নেশা ধরে যায়। কি যেন এক মায়া ও মোহ মনকে আবিষ্ট করে, ভুলিয়ে দেয় অতীত ও অনাগতকে।

নিশ্চল পাথরে গাঁথা মন্দির বা মসজিদের যদি ভয় বা ভক্তি-বিহ্বল মানুষকে মোহগ্রস্ত করবার ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে এমন জীবন ও রোমাঞ্চে ভরপুর বনের পক্ষে সে-মানুষকে মোহগ্রস্ত করবার অপরিসীম ক্ষমতা থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। যুগ যুগ ধরে দক্ষিণ বাঙলার মানুষকে এই বন অভিভূত করে রেখেছে নানাভাবে, বিচিত্র-ভাবে।

তাই বনের উপকূলবাসী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এক ছোট চাষী-সংসারের অভিরাম যখন এই মোহে একবার জড়িয়ে পড়েছিল, কেউ তাকে অভিশাপ দেয়নি, কটূক্তিও করেনি।

যখন সে ছোট শিশু, তার দাদামশায় একবার তাকে কান পাতিয়ে 'বরিশাল গান্' শুনিয়েছিল। গুড়ুম···গুড়ুম···গুড়ুম—বনের ওপর দিয়ে ভাদরের ভরা আকাশ ভেদ করা চাপা নিনাদ ধ্বনি।

দাদামশায় তর্জনি তুলে দিকনির্ণয় করে বলল,—অভি! শুনছিস্, শুনতে পাসনি!

অভিরামের সে-নিনাদ শুনতে না পাবার কিছু ছিল না। উত্তরে শুধু বিস্ফারিত চোখে ধীরে ধীরে মণি-যুগল নাড়িয়েছিল।

—জানিস্ অভি, লঙ্কার রাজা রাবণ। তারই তোরণ-দ্বার আজও খুলছে ও বন্ধ করছে। তারই আওয়াজ। বুঝলি? ঐ শোন্!

শিশুমনে নেশা ধরে যায়। কল্পনা প্রসারিত হতে থাকে বনকে ঘিরে। রাম-রাবণ! সে তো তাব রক্তে—হাজার হাজার বছর ধরে যার কাহিনী এদেশের আবালবৃদ্ধকে আপ্লুত করে রেখেছে। সেই রাবণের সিংহদ্বার। কতবড় না জানি, তাই এমন কামান গর্জনের আওয়াজ।

অভিরাম দু'কানে আঙুল দিয়ে সজোরে চেপে ধরে। বোঁ-বোঁ আওয়াজ হয়—রাবণের চিতা জ্বলছে। সেই রাবণের সিংহদ্বার!

সত্যি কি তাই? সত্য নাও হতে পারে, বানানো কথা। বন! বনই আড়াল দিয়ে রেখেছে সে সন্দেহকে। শুনেছে বনের ওপারে সমুদ্দুর। সমুদ্দুর পার হয়ে রাম লঙ্কায় গিয়েছিল। সেই সমুদ্দুর! হয়তো সত্য। বনের দিকে অভিরাম তাকায় নিবিড় চিত্তে। বনও যেমন সত্য, সুন্দরবনের নিরুপদ্রব কামানগর্জনও তো তেমনি সত্য। সিংহদ্বারের আওয়াজ! হয়তো সবই সত্য। রহস্যময়ী বনের সর্ব আচরণই সত্য বলে মনে হয় শিশু অভিরামের কাছে।

অভিরাম তো এখন অনেক বড়ই হয়েছে। তবুও বনের আচরণ-রহস্যে উদ্বেলিত হতে এতটুকু সময় লাগে না। এ শুধু অভিরামের বেলায় নয়। বনের ছায়ায় যাদের জীবন-বৃক্ষের আনাগোনা চলে, তারা সবাই এমনিধারা। অশীতিপর বৃদ্ধও যেন এখানে এ-বিষয়ে ছেলেমানুষই থেকে যায়। সমভাবে সংসার-জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যেও এরা ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তা না হলে এমনই বা হবে কেন?

নিমাই মোড়ল ছিল অভিরামের সমগোত্রীয়। একখানার বেশি দু'খানা তাদের লাঙল ছিল না। ছিল না তিন বিঘা জমির একটুও বেশি খাস-দখলে। তবুও নিমাই মোড়ল আজ শত বিঘা জমির মালিক।...অভিরামের নিজের চোখে দেখা, মনছুর মোল্লার চার-চালা ঘর, দু'দুটো গোলাভর্তি ধান। তাদের বিস্তৃত উঠানে কবি-গানের লড়াই চলতো রাতভোর। ছুটোছুটি করে কত খেলেছে অভিরাম এই আঙিনাতে সন্ধ্যা রাত অবধি। কোথায় গেল সে-সব। সবই যেন উবে গেছে। সে-আঙিনা আজ লোনা আগাছায় ভরে উঠলেও কেউ দেখবার নেই।

ভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে বিশ্বাসী না হয়ে উপায় কি বা আছে অভিরামের। তাহলেও সে লড়তে চায়—যেমন করেই হোক, তার সংসারের মোড় সে ফেরাবেই।

বকচরের আবাদে বিঘা তিনেক জমি ছিল ওদের ভেড়ির খোলে। তিনজন খাইয়ে,—মা, বাবা ও অভি। এখন আর তিনজন নেই। বিয়ে-থা করেছে। কচি কচি শিশুরাও মুখর করেছে আঙিনাকে। আয় না বাড়ালে তো চলে না। জীবিকা-যুদ্ধের লড়াইতে এরা বিশ্বাসী। লড়াই যে এদের করতে হয় সেরেফ্ বাঁচবার জন্য—প্রতিনিয়ত বন, নদী ও বন্যজীবের সঙ্গে। তেমনি রহস্যে বিশ্বাসী এদের মনও প্রতিনিয়ত আশা করে থাকে—কোনও রহস্যজনক ভাবেই এদের ভাগ্য ফিরে যেতে পারে। তাই নতুন কিছু করবার জন্য অভিরাম পিছ-পা হয় না।

অভিরাম ভাবল,—এ-চকে তো সবাই বড়ান ধান চাষ করে, কিন্তু সে এবার পাটনাই ধান বুনবে। দেখা যাক-না একবার, পাটনাই ধানের বেশ ভালো দরও পাওয়া যায়। নোনার দাপটে পাটনাই ধানের শেষ পর্যন্ত কি হবে কে জানে! অনেকেই মানা করেছে। তবুও দেখা যাক-না একবার। দেখলেও সে। কিন্তু অভিরামের সে-বছর হারও

হলো না, জিতও হলো না। দরে সুবিধা হলেও, ফসলের ঘাটিতে সুবিধা হলো না। হরেদরে এক কথা রইল।

একবার ভাবল,—না, একখানা ডিঙি বানিয়ে ফেলি। বনের সম্পদ তো আছে—কাঠ আছে, মাছ আছে, মধু আছে, গোলপাতা আছে। আর কিছু না হোক, হাটে হাটে বেচাকেনা করে ঘরে মোটা টাকা তুলতে পারবে। হলো সবই। কর্মঠ অভিরামের পক্ষে এসব কাজ তেমন কিছু শক্ত নয়। ডিঙি হলো, বনের সম্পদ আহরণও হলো, হাটে হাটে বেচাকেনাও হলো। ঘরে কিছু বাড়তি টাকা যে এলো না, তা নয়। কিন্তু তা ভাগ্যের মোড় ফেরাবার মতো নয়।

সেদিন শীতের সন্ধ্যায় রঙিনা বাওয়ালির খলেনে আড্ডা জমেছে। এ-চকের সে-চকের ধানের ফসলের, আর দালালদের ধানের দাম কমাবার কথা হতে হতে হঠাৎ বনের কথা উঠে গেল। বাওয়ালির দাওয়ায় বনের গল্প সহসাই উঠে যায়।

বাওয়ালি গল্প বলে যায়,—আর যা-ই বলো, এ-বাদার কোনও হিসাব নেই। কত কি-ই না তোমরা দেখতে পাবে এই বনে। ভিটে-বাড়ির কথা তো তোমরা জানো। কত ভিটে যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। একটু ঘোরাঘুরি করলে দেখতে পাবে, কত মন্দির আছে। কত সাধুর আড্ডা যে ছিল এই বনে! এখন অবশ্য তাদের কোনও দেখা পাওয়া ভার।

কে একজন আড্ডায় বলে উঠল,—বাওয়ালি! তুমি নিজের চোখে কোনও সাধু দেখেছ?

বাওয়ালি হয়ে মিথ্যে কথা বলার উপায় নেই। ঘাড় নেড়ে তাকে জানাতে হলো, না সে ছাখেনি।

তা জানালেও, বাওয়ালিরা অতো সহজে নিজের আধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চায় না। তাহলে যে ওদের আসর ও পসার জমে না। কথার জের টেনে বলল,—তা দেখিনি বটে…কিন্তু সেদিন যা

দেখেছিলাম, তা এ-জন্মে ভোলার মতো না।

অভিরাম আর থাকতে পারে না। বলে ওঠে,—কি দেখেছ? নতুন কি দেখেছ, বলো।

কয়েকটি মুহূর্তের জন্য রঙিনা বাওয়ালি দম নিয়েছিল। কিন্তু সেই কয়েক মুহূর্তের জন্য আসরের সবারই কল্পনা পাখা মেলে নানা পথে। বাঘ, সাপ বা কুমিরের কথা সুন্দরবনে জল-ভাতের মতো। তা নিয়ে নিশ্চয়ই নয়। কেউ ভাবে দৈত্যের কথা। দৈত্য-দানবের দাপটের কাহিনী অনেক বাওয়ালি রসিয়ে ও রাঙিয়ে বলে ; আর সন্ধ্যার আসরের লোকেরা তা মশগুল হয়ে শোনে। অবিশ্বাসও করে না।

আবার কেউ ভাবে, হয়তো বা বনবিবির কথা। বনের আইন-ভঙ্গকারীরা যে বনবিবির হাতে সমুচিত শিক্ষা পায়, বা অনুগতেরা বনবিবির অপরিসীম দয়ায় পুরস্কৃত হয়—এ-সব কাহিনী খুব নতুন না হলেও, বনের উপকুলবাসিদের কাছে প্রতিবারই রোমাঞ্চের কারণ হয়ে ওঠে।

না, সে-সব কিছু নয়। বাওয়ালি বলে চলে,—না, তোমরা যা ভাবছ তা নয়। সেবার গিয়েছিলাম লাসের খোঁজে। আসছি সুপতি বন-অফিসের কাজ সেরে। বাঙড়ামোহনা ঘেঁষে মার্জাল নদীর জোয়ার ধরে। আলকী নদীর ত্রিমোহনায় আসতেই দেখি কাঠুরিয়া নৌকোর এক বহর। কাঠ বোঝাই হয়নি, তবু জোয়ার ধরেছে।

খোঁজখবর নিতেই শুনলাম, ওদের দল থেকে দু'দুটো মানুষ নিয়েছে। কিন্তু যখন ওদের মোড়লকে রাত্রে খোদ্ নৌকো থেকে বাঘে নিয়ে গেল, তখন আর ওরা টিকে থাকতে পারেনি। ভিন্-দেশীদের থাকবারও কথা নয়। কোনও লাস না নিয়েই ফিরে এসেছে। বারবার আমাকে অনুরোধ জানাল, মোড়লের লাস এনে দিতে পারি কিনা। অনেক টাকাও দিতে চাইল। কিন্তু ওরা আর কেউ সে-বনমুখো হতে চায় না।

সেই ক্লাসের খোঁজে গিয়েছিলাম। পথের ঠিকানা বিশেষ দেয়নি। শুধু বলেছিল,—আলকী নদীর ভাটিতে 'নেমক খালাড়ী' ছাড়িয়ে গিয়ে ডান দিকের তিন নম্বর পাশ-খালে। পাশ-খালে ডিঙি ঘোরালেই দেখা যাবে একটা গাব গাছ। সেখানেই ওদের বহর ভেড়ানো ছিল। তোমরা নিশ্চয় ধরতে পেরেছ জায়গাটা কোথায়,—'বড়বাড়ি'র পথে আলকী নদীর মোহনার পশ্চিম-বাদা।

বাওয়ালির জমাটি আসর থমথমে হয়ে উঠেছে। 'বড়বাড়ি' থেকে আলকী নদীর মোহনা এক-ভাটির পথ। 'বড়বাড়ি' মানে রাজা প্রতাপাদিত্যের শিব্‌সা দুর্গ। সুন্দরবনের অন্তস্থলে এই দুর্গ এককালে পশর ও মার্জালের মতো দুই বিশাল নদীর জলপথকে আগল দিত। এই 'বড়বাড়ি'র নামের মাঝে যেন কি একটা মমতা, কি একটা আপন-বোধ রয়েছে। মোগল-রণে যুঝে প্রতাপ কতখানি দক্ষিণ বাঙলার মানুষের মন জয় করেছিলেন জানি না। তবে মগ ও ফিরিঙ্গিদের দমন করে, তাদের অত্যাচার, অনাচার ও কু-আচার থেকে ত্রাণ এনে প্রতাপ এদেশের মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন অনাবিল ও অপরিমেয়।

আলকী নদীর দু'ধারে, বিশেষ করে পশ্চিমে বড় ভীষণ অরণ্যানী। বাদার যারা খোঁজ রাখে, তারা কেউই সহসা এখানে এগুতে চায় না।

রঙিনা বাওয়ালি আবার বলে চলে,—হিসাবে ভুল হয়ে গেল। খরস্রোতা ভাটির টানে তিন নম্বর পাশ-খাল ছাড়িয়ে গিয়ে আরও অনেক দূরে, বোধহয় চার নম্বর পাশ-খালেই প্রবেশ করলাম। ঠিকমতো গাব গাছ পাইনি অবশ্য। তবুও বেশ খানিকটা ভিতরে প্রবেশ করে একটা গাব গাছও মিলল। নিশ্চয় মানুষের আনাগোনা এখানে এককালে ছিল। নইলে গাব গাছ আসবে কেন!

বনে তো কত বছর ধরে ঘুরছি। তবুও আমারও গা ছমছম করতে

লাগল। বেশিদূর এগুতে হয়নি। সে-দৃশ্য ভুলব না। উঁচু ডাঙা। ভিটে মাটি। গাছ-গাছড়া লতাপাতা বিশেষ নেই। ভিটের ওপর ছড়িয়ে আছে—অগুনতি টাকা আর টাকা! চেয়ে দেখি,...সামনেই এক লোহার সিন্দুক। এক-পাল্লা ঢাকনা খোলা। সিন্দুক থেকে মাটি পর্যন্ত যেন রাশি রাশি রূপোর টাকা ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হয় যেন, এই মাত্র কেউ ঠাসা টাকা-ভর্তি সিন্দুকের একটা পাল্লা খুলতেই এমনি ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ধনরাশি।

আসরের একজন প্রশ্ন করলে,—বলো কি বাওয়ালি! তুমি কি করলে?

—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অনেক কথাই মনে এলো। আমি যেন সাহস হারিয়ে ফেললাম। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। মনে হয় আরও দু'এক কদম এগিয়েও গিয়েছিলাম। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারিনি। কোনও 'মায়া' নয় তো!!......

—ফিরে এলাম। লাসের 'তেষ্টা'য় আর যাওয়া হলো না। ফিরে এসে বুড়ো গুরুর কাছে গিয়েছিলাম। শুনতেই গুরু সজোরে চিৎকার করে বলল,—খবরদার! ওর ধারে-কাছে যাবি না। বনবিবির ও-সম্পদে যে হাত দিতে যাসনি, বেঁচে গেছিস।

......সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার আসর কিছুক্ষণ থম্ মেরে রইল। তারপর, এ-কথা সে-কথার পর ভেঙে গেল। রঙিনা বাওয়ালি আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে অভিরাম জিজ্ঞাসা করল,—তখন কি বললে বাওয়ালি?...আলকী নদীর ভাটোতে চার নম্বর ডানহাতি পাশ-খালে?

বাওয়ালি একবার অভিরামের মুখের ওপর তাকাল, তারপর সহজ-ভাবেই উত্তর দিল,—হ্যাঁ। বলেই অন্য কথা পাড়ল,—অম্বুবাচির কর্জ-ধানের কথাটা মনে আছে তো, অভি।

আসর ভেঙে যাবার সুযোগ নিয়ে অভিরাম সেকথার উত্তরে হ্যাঁ বা না—কিছুই না বলেই কেটে পড়লো সেদিনের সন্ধ্যার মতো।

কেটে পড়লো বটে, কিন্তু শৈশবের কল্পনা আর যৌবনের বাসনা মিলে তাকে মোহগ্রস্ত করে রাখল রঙিনা বাওয়ালির এই সন্ধ্যার আসর। কাউকে কিছু বলে না, মনের কথা মনেই লালন করে চলল কিছুদিন।

সপ্তাহখানেক বাদে পিসির বাড়ি যাবে বলে স্থির করল। হড্ডা নদীর কূলে পিসির বাড়ি। আধা জোয়ার এগিয়ে হড্ডা নদীর ভাটিতে পাঁচ বাঁকের মাথায় এই গাঁ বা আবাদ। ডিঙি গোছগাছ করে নিল। বাড়িতে বলে গেল, পিসির বাড়ি একরাত কাটিয়ে বুধবার নলেন বন-অফিস হয়ে বিষ্যুৎবার নাগাদ ফিরবে। যাবার পথে ছেলেবেলার বন্ধু মধু কাপালির কাছ থেকে গাদা-বন্দুকটি চেয়ে নিয়ে গেল। তাকে বলল,—হড্ডা ও শিব্‌সার মোহনায় মদনা ও মানিক-জোড় পাখির যেন মেলা বসে। পিসিদের একদিন পাখির মাংস খাওয়ানো তার বড় লোভ।

বিষ্যুৎবার পার হয়ে গেল। শুক্র, শনি, রবিবারও পার হয়ে যায়, তবুও অভিরামের ঘরে ফেরার নাম নেই। দেখতে দেখতে যখন আরেক বুধবারও পার হয়ে যায়, সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। সাধারণত বনের মানুষেরা অতো সহজে এ-বিষয়ে চিন্তিত হয় না। বনবাদাড়ের রাজ্য, সময় ও দিন ঠিক রেখে চলা দুরূহ। কিন্তু অভিরাম তো এবার পিসির বাড়ি গেছে, তা'তে এত দেরি দেখে সবাই বলল,—এমন তো হবার কথা নয়।

তার ওপর মধু কাপালি তার নিজের বে-পাশি বন্দুকটা নিয়েও ভাবনায় পড়েছিল। এখনও অভিরাম ফেরে না কেন? বে-পাশি বন্দুক নিয়ে ধরা পড়ল না তো!

মধু কাপালি খোঁজ খবর নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অভিরামের পিসির বাড়ি গিয়ে হাজির। তারা বলল,—কই, অভি তো এমুখো আসেনি!

কাপালি শুনে তো অবাক। শুধু অবাক নয়, চুপ হয়ে যায়! কিসের আশঙ্কায় যেন মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে কাপালির।

এমন অবস্থায় বাদা-অঞ্চলে বাওয়ালিরাই একমাত্র আশ্রয়। রঙিনা বাওয়ালিকে একান্তে ডেকে কাপালি পরামর্শ করতে চাইল। মুহূর্ত মধ্যে বাওয়ালির সেদিনকার সন্ধ্যার আসরের কথা মনে জাগে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাতে এক-বদ্‌না জল ছিল। হঠাৎ উপুড় করে গোটা জলটাই ঢেলে দিল। শীতের নোনা মাটি শোঁ-শোঁ করে এক-বদ্‌না জল শুষে নিল। বাওয়ালি সেদিকেই তাকিয়ে। পরমুহূর্তে কাপালির চোখে চোখ রেখে বলল,—চল্, ডিঙি ঠিক কর্। কাউকে বলবি না। তুই এগো, আমি আসছি।

বাওয়ালি ও কাপালির ডিঙি নদীপথে এক ক্ষীণ দোয়ানিয়া খালের স্রোত ধরে নলেনের বন-অফিস এড়িয়ে শিব্‌সায় পড়ল।

তারপর আড়ুয়া শিব্‌সা। এবার মার্জাল নদীর ভয়াবহ স্রোতের টানে বাওয়ালি হাল ধরেছে শক্ত হাতে। জোয়ার আসবার আগেই আলকী নদী ধরতে হবে। তা না হলে বানের তোড়ে কোথায় যাবে ডিঙি কে জানে!

হিসাবে ভুল হয়নি। বান এসে পড়বার আগেই বাওয়ালি আলকীর মোহনার ঘোলা এড়িয়ে ওপারের বনের কোলে আশ্রয় নিল।

কাপালি নিমিত্ত মাত্র। কাপালি শিকারী, হরিণ শিকারে অনেকবারই বনে এসেছে। কিন্তু বন্দুক ছাড়া এমনভাবে এমনিধারা কোনও দুঃসাহসিক কাজে কারও সাথী হয়নি। বনের সরু 'খাড়ি'তে ডিঙি ঢুকিয়ে দিলে কাপালি বলল,—বাওয়ালি, এবার গাছে উঠে বসলে হয় না?

—দূর বোকা! জানিসনে, আলকী দু'মুখী। মার্জাল থেকে উঠে মার্জালেই ডুব দিয়েছে। জো'র বান এলে দু'মুখ দিয়েই জল ঢুকবে।

সেই জো'তেই আমাদের এখনই রওনা হতে হবে। পানি থমকে দাঁড়িয়েছে, জো' এলো বলে।

বানের ধকল সামলে নিয়েই জোয়ারে ডিঙি ভাসিয়ে ওরা এগিয়ে চলে।

বেলা সবে গড়িয়েছে। চার নম্বর খালে পৌঁছতে বিশেষ দেরি হলো না।

বাওয়ালি ভাবছে, কাপালিকে নিয়ে কোন বিপদে না পড়তে হয়! বিপদের সামনে কোন্ মানুষ কি হয়ে যায়, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

আশ্চর্য! খালের মুখে ডান-হাতি গরান গাছটায় অমন করে একটা বানর কঁ্যাচ্-কঁ্যাচ্ করছে কেন? বাওয়ালির হালের চাপে ডিঙির গতি মন্থর। বারবার লক্ষ্য করেও হদিশ পাওয়া যায় না। ডিঙির উপর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বানরটার দিকে তাকিয়ে বাওয়ালি বুঝবার চেষ্টা করল। ডিঙির ওপর দাঁড়াতেই বানর যেন আরও ডাকাডাকি করতে থাকে।

বাঘের গন্ধে বা ভয়ে? না, তাহলে তো একগাছে অমনভাবে স্থির হয়ে থাকতো না। এক ডাল থেকে আরেক ডালে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতো। তবু বলা যায় না, হলেও হতে পারে! বানরের ক্রোধ, ভয়, মায়া-মমতা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতা বোঝা দায়। বিশেষ করে বন্য বানরের।

রঙিনা বাওয়ালি ইঙ্গিতে কাপালিকে জানায়,— চল্, ডাঙায় উঠতে হবে।

বাওয়ালি নিজের গলুইটা চরে লাগিয়ে প্রথমে একাই ডাঙায় উঠল। ভালো করে দেখে নিতে চায় যতদূর দৃষ্টি যায়। কিন্তু বাওয়ালি এধার ওধার দেখবে কি, বানর ততক্ষণে সামনের গাছে লাফিয়ে আবার কিচিরমিচির করতে থাকে। তবে কি বানর ওদের দেখেই ভয়ে অমন করছে!

কাপালি বাওয়ালির পেছনে এসে গেছে। দু'জনে এবার সামনের গাছের তলায় এগিয়ে গেল। এগিয়ে যেতে না যেতেই বানর এক লাফে তারও সামনের গাছটায় গিয়ে সমানে আবার কিচিরমিচির করে।

ওরাও এগিয়ে যায়, বানরও গাছের পর গাছ এগিয়ে যায়। বাওয়ালি ভাবে,—ওদেরই ভয়ে বা যে-জন্যেই হোক, বানর যেদিকে চলেছে সেদিকে 'বড়-মেঞা' নিশ্চয় নেই। থাকলে বানর কখনও সে-মুখো হতো না।

এগুতে এগুতে তো অনেক দূরই এলো। বানরের বাঁদরামি তবুও থামে না। হ্যাঁ, বাওয়ালির একবার বাঁদরামির কথাই মনে হয়েছিল! পেছনে তাকাল,—দূরে কোনমতে নদীর ফাঁকা আলো দেখা যায়।

এ কোন্ ফাঁদে পড়তে হলো আলকীর চার নম্বর খালে! বাওয়ালি তার বৃদ্ধ গুরুর নির্দেশের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করে।

না,···বানর তো এবার আর এগুতে চায় না। মাথার উপরই কিচিরমিচির করে চলেছে। বানরের এমনিতে ডাক খুবই মিষ্টি। সে-ডাকে যেন তার হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত হয়। কিন্তু শান্ত ও নিঝুম পরিবেশ ছাড়া সে-ডাক সে ডাকে না। তেমন পরিবেশ না হলে সে-ডাকের স্নিগ্ধতা ধরাই পড়ে না যে! সে-ডাকের আহ্বানে সঙ্গিনীরা এসে জড়ো হয়, হরিণের পালও এগিয়ে আসে নির্ভয়ে। কিন্তু বিচলিত ও উতলা মনের এই কিচিরমিচির আর দাঁত খিচুনির অর্থ বোঝা দায়!

এতক্ষণে বাওয়ালি ও কাপালি বুঝি এদিক-ওদিক দেখবার অবকাশ পেল। দেখবে কি! সম্মুখেই ভীতিপ্রদ অজস্র পদ-চিহ্ন। এক পদ-চিহ্নের উপর আরেক পদ-চিহ্নের ছাপ। হেঁটে চলে যাবার চিহ্ন নয়, বারবার হাঁটাহাঁটির নজির।

·········পচা গন্ধ ! ভুক্ত লাস সামনেই পড়ে আছে। মানুষের লাস। বন্দুক ! বন্দুকটাও সামনে পড়ে আছে। বে-পাশি বন্দুক !

কাপালি আর কাপালি নেই। হাত-পা কাঠ হয়ে এসেছে। পড়ে যাবে বুঝি। বাওয়ালি হঠাৎ এক ধাক্কা মেরে অস্বাভাবিক জোরে বলল,—যা,·· নে বন্দুকটা,···নিয়ে আয় !

এমন কড়া আদেশই বোধহয় আবশ্যক ছিল মধু কাপালির সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে।

সুন্দরবন হিংস্র বন। হিংস্র বনেরও বুঝি মায়া ও মমতা আছে। আলকী বন ছেড়ে যাবার বেলায় বাওয়ালি তারই ইঙ্গিতে অভিভূত। ডিঙির বাঁধন খুলবার আগে কাপালিকে বলল,—মধু, গামছায় চিঁড়ে কলা ছিল না ? দে, গিট্ খুলে ওই চরে রেখে দে। যা আছে সবটাই রেখে দে।

বানরটার কিচিরমিচিরে এতক্ষণে আরও দু'একটা বানর এসে জুটেছে। তারা সবাই চরের সেই গরান গাছটায় চুপচাপ বসে আছে।

দেখতে না দেখতে আবাদের ডিঙি বাদার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।
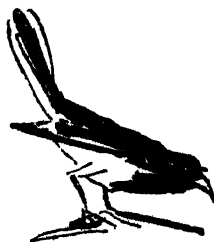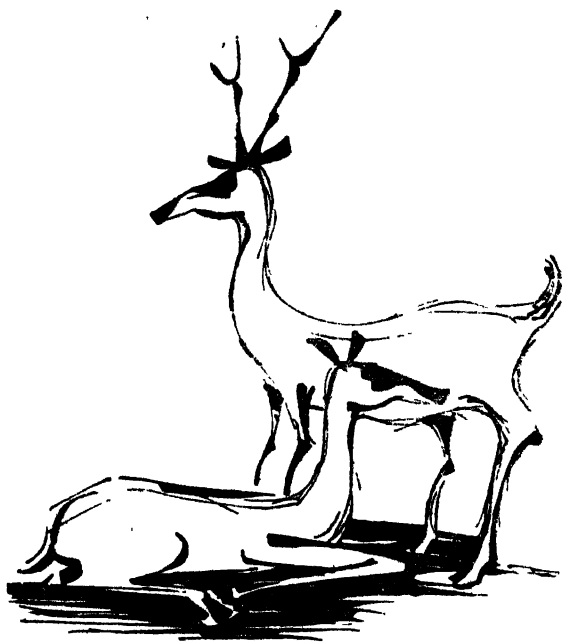
আ ট

দুর্ধর্ষ হলে, বনেই দুর্ধর্ষ হতে হবে—এমন আশা করা বাদা-আবাদের মুখোমুখি বাসিন্দাদের কাছে স্বাভাবিক। তাই মোকামের সমবয়সী অধর গাইন ব্যঙ্গ সুরেই বলল,—থাক্, বোঝা গেছে তোর ওস্তাদির কথা! পারবি এই মালঞ্চকে ঘায়েল করতে?

পারুক আর না পারুক মুখে আস্ফালন করতে বাধা কি! বলল,—রেখে দে তোর মালঞ্চ-ফালঞ্চ। ইচ্ছে করলে কি না হয়!

সুন্দরবনের মাঝামাঝি মালঞ্চ নদী। অধর গাইন কিন্তু হরিণ মালঞ্চের কথাই বলেছিল। বনের হরিণের নাম আবার কে দেবে! তবু মালঞ্চ নদীর এপারের অধিবাসীরা ওপারের বনচারী এক হরিণের পরিচয় দেয় মালঞ্চ নামেই।

সুন্দরবনের মানুষ বন্য হরিণের সৌন্দর্য বিশেষ মুগ্ধ নয়নে ছাখে না। কিন্তু বাঘের কথা বলো, অমনি তার সৌন্দর্য বর্ণনায় মেতে উঠবে। চেহারায় শৌর্যের ছাপ না থাকলে ওদের মনই ধরে না। কিন্তু মালঞ্চ চঞ্চল, চপল, ভীতিবিহ্বল বন্য হরিণ হলেও, তার ঔদ্ধত্য দিয়েই এপারের মানুষের মনকে জয় করেছে।

বাঁকের মাথায় বনের টেক্। এখানে বন যেন নদীর মধ্যে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই টেকের মাথায় মালঞ্চকে হামেশাই দেখা যাবে। কত শিকারী কতভাবেই না চেষ্টা করেছে মারতে। কিন্তু এমন সজাগ যে, বন্দুকের পাল্লার মধ্যে মালঞ্চকে আনাই ছুরূহ। যদিও বা আনা যায়, নিরিখের অবকাশ দেবে না। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উধাও হবে তার ঠিকানা নেই। প্রথম প্রথম দেশী-বিদেশী অনেক শিকারীই চেষ্টা করেছিল। সকলকেই ব্যর্থ হতে দেখার পর এই হরিণকে নিয়ে আবাদের মানুষের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই।

কেউ বলত, মানুষের প্রতি মালঞ্চের নিশ্চয় কোনও বিশেষ টান আছে। তা না হলে এমন বেপরোয়া আনাগোনা করবে কেন!

কেউ বলত, বনবিবির সঙ্গে মালঞ্চের যোগ না থেকেই পারে না! পাল্লার মধ্যে পেয়েও শিকারীর হাত তা না হলে বারবার কেঁপে ওঠে কেন!

কারণ যা-ই থাকুক—এই টেকের মোহ মাতোয়ারা করবার মতই। সামান্য এক-রশি পরিসর জমি। খটখটে জমি। অথচ সুন্দরবনের নাম-করা গাছ সবগুলিই প্রায় আছে—বাইন, গরান, কেওড়া ও সুন্দরী।

তিন দিকে নদী। ফাঁকা আলো ও বাতাস। দাঁড়িয়ে হোক বা শুয়ে হোক মালঞ্চ বেশ দেখতে পায় বনের মানুষের আনাগোনা। ডিঙি ও নৌকো করে ওরা যায় ও আসে। কেউ গল্প করে, কেউ নিঃসাড়ে, কেউ বা গান গেয়ে।

আনেকদিন হলো আবাদের লোক ওকে আর মারবে না বলেই

ঠিক করেছে। নিজেরা মারবার চেষ্টা করে না, বাইরের কোন শিকারীকেও ওরা মারতে দেয় না। মারতে বাধা দেওয়া না দেওয়া একই কথা। কারণ ওদের এখন দৃঢ় বিশ্বাস, মালঞ্চকে কেউ মারতেই পারবে না।

দীর্ঘ শিঙ। অস্বাভাবিক দীর্ঘ। তবু মালঞ্চের দেহ অনুপাতে বেমানান নয়। সাদা ডোরাগুলি দু'পাশে যেন ঋজু রেখায় সাজানো। আবাদের মানুষ তো অনেক হরিণ দেখেছে। কিন্তু এমনটি বড় দেখা যায় না। গণ্ডদেশের ছোপ যেন ধবধবে সাদা। বিলম্বিত কান দু'টি সচকিতের মূর্ত প্রতীক। যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়ে যে-কোন দিকের ক্ষীণ আওয়াজ গ্রহণ করতে পারে। বনের সব হরিণই এ-ক্ষমতা রাখে। কিন্তু মালঞ্চের এক বিশেষত্ব আছে।

খুব লক্ষ্য করলে এই বিশেষত্ব ধরা না পড়ে যায় না। হরিণ যখন যেদিকে দৃষ্টি ছায় সেদিকের শব্দ ইঙ্গিতে ধরবার জন্য কর্ণ-যুগলকে বর্শার ফলকের মতো বাঁকিয়ে ধরে। কিন্তু মালঞ্চ যখন দৃষ্টি দেবে সামনে, কানকে ঘুরিয়ে ধরবে পেছনের আওয়াজে সজাগ হবার জন্য। আবার চোখের দৃষ্টি পেছনে দিলে, কানকে তৈরি রাখবে সামনের আওয়াজ ধরবার জন্য। অনেকে অনেকভাবে মালঞ্চকে দেখেছে বলে, তার এই দুই দিকেই সজাগ থাকবার বিশেষ পারদর্শিতার কথা সবারই জানা।

মালঞ্চের এতো ইতিহাস আছে বলেই অধর গাইন সেদিন অমন সহসা মোকামের ওস্তাদিকে মালঞ্চের নাম তুলে ব্যঙ্গ করল।

ব্যঙ্গ করলেও এর পরিণাম কতদূর যেতে পারে তা অধরের অজানা ছিল না। সেই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি ও-কথা চাপা দিয়ে বলল,—সেদিন নারানপুর হাটের 'কায়জে'র কি হলো শেষ পর্যন্ত?

খানিকটা হতাশার রেশ টেনে মোকাম বলে,—হবে আর কি! ঢাল, সড়্‌কি, মায় বন্দুকও হাজির করতে কসুর করিনি। শেষ পর্যন্ত

ভয় পেয়ে দু'তরফই মিটমাট করল। যেমন চৌধুরির কাছারি, তেমনি মিত্তিরদের কাছারি। কেউ নদী পার হলো না। যে পারের যে।

—তার মানে ?

—মানে আর কি! ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম একাই। কেউ না এগুতে চায়, আমি একাই সড়কি নিয়ে গাঙ্ পার হব। তাই কি আর দিলো! সবাই মিলে শুধু—'সবুর! সবুর! দেরি কর!' আরে, অমন দেরি করলে কি কিছু হয়! আর কিছু হতে পারে কিন্তু 'কায়জে' আর হয় না।

—তাহলে হাট-ফাট আর বসবে না ?

—বসবে না কেন! নদীর দু'পারেই হাট বসবে।

—তার মানে সওদার ফেরে একবার আমরা এ-হাট আর ও-হাট করে পারাপারি করব! না?

তা'তে ওদের আর কি হয়েছে! কাছারির তো হাট তোলার ব্যাপার। আমাদের লাভের লাভ, ধান চাল নিয়ে একবার এ-হাট একবার ও-হাট করতে হবে; আর দু'হাটেই দুই কাছারিকে তোলা দিতে হবে।

যেন ঢেউয়ের নিচে জলের শিরা চিনতে পেরে অধর মাথা নেড়ে বলে উঠল,—ঠিক বলেছ. এরই নাম মালেকের কৌশল!

'মালেকের কৌশল' মাথায় ঢুকতে তখনকার মতো যে যার চলে যায়।

মোকাম কিন্তু মালঞ্চের কথা ভুলতে পারে না। জায়গা-মতো ব্যঙ্গ করলে, লোকে সেকথা সহসা ভোলে না। যে-সাহসিকতার ওপর তার নিজের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে—তার ওপর অধর গাইন নয়, মালঞ্চই ব্যঙ্গ করছে বলে যেন তার মনে হলো। মালঞ্চই বা কেন, গোটা বনই যেন ওর দুর্ধর্ষতাকে পরিহাস করছে। এর সমুচিত উত্তর দিতেই হবে! লোকের বারণ! বারণ তো এমনি হয়নি। মারতে

পারেনি বলেই তো বারণ এসেছে। যদি কেউ মেরে ফেলতো, তাহলে কি আর এসব কথা উঠতো! এবার মোকামের শিরায় যৌবনের রক্ত বারণ-মানাকে উপহাস করে ওঠে!

তোড়জোড় করার কিছুই নেই। বন্দুক তো ঘরেই আছে। ঘাটে কারও না কারও ডিঙি পাওয়া যাবেই। আর বোঠের হু'খোঁচ দিলেই তো গহন বন।

তবুও মোকামের তোড়জোড় শুরু অন্যভাবে। মালঞ্চের টেঁকের দিকে মোকাম প্রায়ই আনাগোনা করে। কয়েকবার মালঞ্চের সঙ্গে দেখাও হলো।

কিন্তু সকালে একবারও দেখা হয়নি। বেলা গড়ালে তবে মালঞ্চ এখানে আসে। খাবার খুঁজবার চেষ্টা এখানে বিশেষ করে না। ঘোরে ফেরে, বসে চর্বণ করে, আবার ঘোরে ফেরে। একবার তো ডিঙির ওপর বসে বোঠেখানা বন্দুকের মতো ধরে মোকাম তাক্ করতে গিয়েছিল। মুহূর্ত মধ্যে মালঞ্চ যেন কোথায় উবে গেল।

অবশেষে 'গাছাল' দেবার কথা মোকাম ভেবে নিয়েছে। বেলা হতেই গাছে উঠবে। অনেক, অনেক উপরে উঠে বসতে হবে। চার হাতের উপরে হরিণের দৃষ্টি যায় না, তবু বলা যায় না, মালঞ্চ সব ব্যাপারেই স্বতন্ত্র।

একদিন মোকাম সকাল-সকাল গাছে উঠে বসলো। খুব উপরে কায়দা মতো তে-ডালাও পেলো। গাছাল শিকারে বিশেষ অসুবিধা নেই। তবে ধৈর্যের পরীক্ষা। নিঃশব্দে অপেক্ষা। মশা, মাছি, পিঁপড়ে —সব-কিছুই উপেক্ষা করে আগমন-পথে কান পেতে থাকতে হবে। বিড়িটিও পর্যন্ত খাওয়া চলবে না।

যতই বেলা গড়িয়ে আসে, ততই মোকাম সজাগ ও সচকিত হয়ে ওঠে। দুপুরে যাও-বা একটু বাতাস ছিল, তাও স্থির হয়ে এসেছে। জোয়ারের জলের চাপ এসে নদীর স্রোতকেও স্তব্ধ করে দেবার

মতো। চারিদিকে নিস্তব্ধতা।

বেশ দেখতে পায়, চার-পাঁচ জনের একখানা ডিঙি জোয়ারের শিরা ধরে এগিয়ে আসছে। মোকাম চিন্তায় পড়ল। এবার মালঞ্চ এলে তো বিপদ। সবই জানাজানি হয়ে যাবে। মনে মনে কামনা করল—তোরা এলিই যখন, তখন জোরে, আরও জোরে বেয়ে যাস্ না কেন!

ডিঙি চলে যেতেই আবার নিঃসাড়। হাত-পা অবশ করে গাছের ডালে বসে আছে। আরও কতক্ষণ বসতে হবে কে জানে! একঝাঁক সাদা বক এসে টেকের গাছগুলির উপর চক্কর দেয়। সুন্দরবনে যখন এমনি বকের ঝাঁক কোনও গাছে বসে—সে-গাছকে প্রায় সাদা করে তোলে।

সঙ্গী পেয়ে মোকামের মজাই লাগছিল! ঝাঁকের অর্ধেক ততক্ষণে গাছের মাথায় বসেছে। তাদেরই নিচে মোকাম। হঠাৎ গোটা বকের ঝাঁক যেন ঝাঁকা মেরে পাখার বিকট ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেল। হয় তারা মোকামকে দেখেছে, না-হয় তার গন্ধ পেয়েছে।

তবু মোকাম ঠিকই বসে আছে। যার আসার কথা, তার প্রতীক্ষায়।

··পড়ন্ত বেলা। মিছেমিছি প্রতীক্ষা। অবশেষে বিরক্ত হয়েই মোকাম সেদিনের মতো ফিরে এলো।

গাছাল শিকারে বিফল হওয়াতে মোকাম এবার একদিন মাঠাল শিকার পরখ করতে চায়।

পায়ে হেঁটে শিকার। শূলোর ফাঁকে ফাঁকে, শুকনো পাতা ও ডাল এড়িয়ে এড়িয়ে নিচু হয়ে চলেছে। অনেকখানি নুইয়ে চলেছে। বন্দুকের ভারও নুইয়ে চলতে সাহায্য করেছে। আরেকটু এগুলেই টেকের দিকে আড়াল দিয়ে চলতে হবে। মোটা গাছ বা জোড়া গাছের আড়ালে আড়ালে। ঠিক যেমনটি বাঘ তার শিকারের দিকে

এগিয়ে আসে।

ঠিক বাঘের মতো বটে, কিন্তু অমন তুলতুলে নরম পায়ের বিচরণ মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব! অমন নরম আধারে এক এক থাবায় আঠারো মানুষের বল কি করে বাঘ ধারণ করে—তা এক আশ্চর্য!

…টুক্ করে শব্দ হলো—পায়ের চাপে মরা শামুকের খোল ভেঙে যাবার শব্দ। মোকাম প্রমাদ গোনে—তোর তো যাবার কথা চুনখোলায়, তা এখানে এসে মরেছিস্ কেন! এতোদূর এগিয়েও বুঝি বা হতাশ হতে হবে!

না, বনের আর কোনও জীবকে শামুক ভাঙার শব্দ সন্ত্রস্ত করে তোলেনি। এগিয়ে চলল নিঃশব্দে! নিঃশ্বাসকে প্রায় স্তব্ধ করে।

বেশ কিছুটা নদীর কূল ঘেঁষেই মোকাম চলেছিল। 'ওড়া' গাছের ঝাড়ের কম্পনে কেমন যেন জীবনের স্পন্দন। তাহলে? না, মালঞ্চ না হয়েই যায় না। দীর্ঘ শিঙের দ্বিতীয় স্তবক দেখা যায়। মোকাম এবার অতি সাবধানী। আরও কয়েক কদম এগুতে হবে। তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সহসা কিছুটা ডাইনে বানরের সন্ত্রস্ত কিচিরমিচির। সঙ্গে সঙ্গে— ট্রিউ! ট্রিউ! ট্রিউ! আর নদীর কিনারায় ওড়া গাছে একটু শব্দ; ব্যস্, আর কিছু না। মোকাম নুয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সতর্ক সন্ধানীর মতন। শিকার এবার যাবে কোথায়? তিন দিকে নদী। বনের দিকে আসতে হলে মোকামের সামনে দিয়েই যেতে হবে। এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে মোকাম বন্দুকের নল উঁচিয়ে আছে।

বিশ্বাস ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। মোকাম তাড়াতাড়ি টেকের পরে এগিয়ে যায়। কোথাও কিছু নেই। পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে বুঝতে চায়। সে-চেষ্টা আর করতে হয় না। স্পষ্ট দেখতে পেলো,…দূরে নদীর জল ছেড়ে উঠে পড়েছে। উঠতে না উঠতে

মালঞ্চ বনের অতলে উধাও।

*   *   *   *

এবার বাদা থেকে আবাদে ফিরে আসা অবধি মালঞ্চের নদী-পথে পালাবার ছবি বারবার মোকামের মনে ভেসে ওঠে। কেমন করে অতোবড় জানোয়ার নিঃশব্দে নদীর জলে পড়লো। না, হয়তো বা জলের শব্দ তার কানে আসেনি। কিন্তু না আসবার কারণ তো ছিল না। তেমন দূরে তো সে ছিল না। তাহলে মালঞ্চ নিশ্চয় তাকে দেখতে পায়নি। দেখতে পায়নি বলে ভয়ার্তের মতো হয়তো সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচতে চায়নি। বনে বানরের বিপদ সংকেতধ্বনি কিচিরমিচির শুনতে পেয়েই সরে পড়েছে মাত্র!

মনে মনে খানিকটা সমাধান পেলেও মালঞ্চের শিঙ উঁচিয়ে সাঁতরে পালাবার ছবি বারবার তার কাছে স্বপ্নের মতো ভেসে ওঠে।

অধর গাইনের সঙ্গে ইতিমধ্যে কয়েকবারই দেখা হয়েছে। মোকাম একবারও তার কাছে বনের কথা তোলে না, পাছে বন থেকে মালঞ্চের কথায় এসে যায়। দুর্ধর্ষতার পরীক্ষার আগে মালঞ্চের নামও সে মুখে আনতে চায় না।

একবার তো অধর বলে বসে,—কি রে মোকাম! অনেক দিন মাংস-টাংস খাই না! এর মাঝে কেউ বনে-টনে গেল না?

মোকাম তাড়াতাড়ি বলে,—রাখ্ সেকথা, আগে তোর গো-হাটের কি হলো তাই শুনি দেখি!

—না, এবার তেমন আমদানি হয়নি। যা পেলাম তার থেকেই বেছে একটা গাই গরু এনেছি। জানি না ক'দিন নোনা-পানি খেয়ে বাঁচবে। আরে ভাই, আনা-টানা কি যাই-তাই কথা!

—কেন, কি বিপদে পড়লি?

—তা আর বলার না! মুশকিলে পড়লাম আশাশুনির খালে। না আছে খেয়া, না আছে পাটনি। ধারে কাছেও কোনও ডিঙি নেই। ওর নাম 'ডাকাতির খাল'। বেলা গড়াতেই কোন নৌকোর পালের চিহ্নও দেখা যাবে না।

—কি করলি তবে? সঙ্গে তো গরু আছে!

—আরে শুধু কি গরু, মিঠে পানির গরু! তা'তে আবার গাই গরু! জলে কি নামতে চায়! নিজেই আগে জলে নেমে টানাটানি করে সাঁতরে পার হয়ে এলাম।

—সাঁতরে! —মোকাম কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

নদী-নালা দেশের লোকের পক্ষে সাঁতার কথাটায় অমন জোর দেওয়া নিতান্তই অস্বাভাবিক। অধর গাইনের কানেও খট্‌কা লাগে। কথাবার্তাও আর বেশি এগোয় না।

ক'দিন পরেই মোকাম হিঙ্গে গাছের কাঠ খুঁজে বেড়ায়। হিঙ্গে গাছের কাঠ ভারি পাতলা। এদেশে পাঙ্গাস বা অন্য মাছ ধরার জাল ঐ কাঠ দিয়ে ভাসিয়ে রাখে। যেন সোলার মতো হালকা কাঠ। আটি বেঁধে বেঁধে ভেলার মতো বানিয়ে ফেললো। তার ওপর কাঁচা ডালপালা সাজিয়ে দিতেই পুরো ফাঁদ তৈরি হয়ে যায়। জলের ওপর ভেসে চলতে থাকলে, কোন ঝাঁকাল ভাঙা ডাল ভেসে আসছে বলে ভ্রম হবেই হবে।

সেদিন পড়ন্ত বেলায় পুরো জোয়ার। ভরা জোয়ার না হলে সমস্ত ফাঁদই বেচাল হয়ে যেত। সুন্দরবনের নদী জোয়ার ভাটায় ওঠা-নামা করে দশ বারো হাত। ভাটিতে জলের ওপর থেকে তীর দেখা, আর মাটি থেকে একতলা বাড়ির ছাদ দেখা এক কথা। তখন জলের সমতল থেকে তীরের জীবকে লক্ষ্যে আনা দায়।

উজানে অনেকখানি এগিয়ে মালঞ্চের চোখের আড়ালে নদী পার

হয়ে মোকাম হিজের ভেলা ভাসিয়ে দিল। মালঞ্চ সেদিন ঠিকই এসেছে। ভেলার ওপর বন্দুক রেখে ডালপালার আড়ালে মোকাম সাঁতরে চললো। ঠিক সাঁতার নয়। ভেসে ভেসে চললো যাতে এতটুকু 'সাড়' না হয়।

আবাদের নদীতে অমনভাবে ভেসে যাওয়া খুবই বিপদ। কুমিরের অবাধ আনাগোনা। ডাঙার জীবের মতো জলের জীব অতো বুদ্ধি ধরে না, তাই ভয়ডরও কম। বেপরোয়া আক্রমণ করে বসে। তবে ওদের আনাগোনার ইঙ্গিত মেলে। আশে পাশে তখন শুশুক অনবরত উঠছে আর 'শোষ' 'শোষ' করছে। মোকাম নিশ্চিন্ত ছিল, অন্তত ধারে কাছে কুমির আপাতত নেই। কিন্তু হাঙর অজস্র এবং যেখানে সেখানে। চুপিসাড়ে এসে প্রায় চুপিসাড়েই হাত-পা কেটে নিয়ে যায়। মোকাম আজ মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে--শিকার-নেশায় মত্ত। অমন এক্‌-আধটু বিপদকে আমল দেবার অবকাশ তার নেই।

মোকাম এগিয়ে চলেছে। মালঞ্চ এপাশ ওপাশ পাক খেয়ে খেয়ে তার চপলতার আভাষ দিচ্ছে। দূর থেকে মোকামকে লক্ষ্যে আনবে কার সাধ্য!

মোকামের কি যেন পায় ঠেকে। বাদার নদীতে সাঁতার দিতে গিয়ে অগুনতি বড় বড় মাছের গায়ে পা লাগবে তা'তে আর আশ্চর্য কি আছে! মোকামের আশঙ্কা—হাঙরে না পেছন ধরে। জলের নিচে জোরে জোরে নিঃশব্দে পা দাপাদাপি করল।

আর এগুবার আবশ্যক নেই। আওতার মধ্যে এসে গেছে। এবার ধীরে অতি ধীরে কূলের দিকে এগিয়ে যায়। দেখে মনে হবে যেন ভাসমান ডালপালা জোয়ারের টানে ঘোলায় পড়ে কূলের দিকে নিজে নিজেই পাক নিচ্ছে।

পায়ের নিচে মাটি ঠেকতেই বেশ শক্ত হয়ে খুঁটি নিল। লক্ষ্য

মালঞ্চের প্রতি। মালঞ্চ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দীর্ঘ ঘ্রাণ নেবার যেন চেষ্টা করছে। মোকামের বিপরীত দিকেই নাক যেন উঁচিয়ে ধরেছে। এই ক্ষণিকের সতর্ক স্তব্ধতা পর-মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে উধাও হবার পূর্বাভাষ। নাসারন্ধ্র ঊর্ধ্বমুখী করে দীর্ঘ শৃঙ্গকে পিঠের ওপর বিছিয়ে দিয়ে পদসঞ্চালনে বন্য হরিণ যে কী ক্ষিপ্রতা আনতে সক্ষম, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা দুরূহ। মনে হবে না যেন, এ কোনও ভয়ার্ত জীবের পলায়ন। বন্য হরিণ যেন তখন আগন্তুকের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানায়,—আছে তোমাদের পায়ে ও অঙ্গে এই ক্ষিপ্রতা?

এমন অবস্থায় মোকাম দেরি করতে চায় না। করেও না। দড়াম্ করে গুলি চালিয়ে দিল।

কিন্তু গুলির আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনবে কি, বীভৎস আওয়াজ ব্যাঘ্রগর্জনের। মুহূর্ত মধ্যে বনের মাঝে যেন তোলপাড়। গর্জনের প্রতিধ্বনি একে অন্যের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মিলিয়ে গেল।

মোকাম থতমতো খেয়ে গেছে। দিশেহারার মতো কয়েকবার গুলি করে দিল বনকে লক্ষ্য করে। বন্দুকের আওয়াজ থামতে বনও থম্ মেরে গেছে। মোকাম দাঁড়িয়ে আছে। কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। তীর ধরে ডিঙিতে হাজির হবার সাহস নেই, নদী-পথে উজান ঠেলে ডিঙি পর্যন্ত পালাবার উপায়ও নেই, ক্ষমতাও নেই।

একটু পরে বাঘের গোঙানি বেশ খানিকটা দূরে মনে হতেই দম বন্ধ করে এক-ছুট। তারপর দ্রুত ডিঙিতে উঠেই এক ধাক্কায় মাঝ-নদী।

মাঝ নদীর আশ্রয়ে আসতেই মোকামের মনে দুর্ধর্ষতার হিসাব, জয়-পরাজয়ের হিসাব গুলিয়ে যায়। জেগে ওঠে মমতা। মালঞ্চের প্রতি অসীম মমতা। কেন অমন করে বনের এক নিরীহ জীবকে বাঘে ও মানুষে মিলে ঘেরাও করে মারতে গিয়েছিল!

বারবার বহুবার বহুদিন ধরে মোকাম কামনা করেছে, মালঞ্চ

যেন সে-যাত্রা বেঁচে থাকে। কত দিনই না আসতে যেতে সেই টেকে উঁকি মেরেছে, মালঞ্চকে দেখতে পাবার আশা নিয়ে। পায়নি দেখতে।

কিন্তু ক'দিন আর! মালঞ্চ আবার আসতে শুরু করেছে। কিন্তু সে-মালঞ্চ আর নেই। শিঙ-ভাঙা মালঞ্চ। একটা শিঙের দুটি স্তবকই নেই। তবু ভাঙা শিঙেও মালঞ্চের ঔদ্ধত্য অস্পষ্ট থাকে না। মালঞ্চ আসে—কিন্তু পড়ন্ত বেলায় আর আসে না। সকালের দিকে আসে, সকালেই ফিরে যায়।

ন য়

ছোট একখানা ডিঙি চলেছে। খানিকটা ছিপের ঢঙে তৈরি। ডিঙিতে মাত্র দু'জন—কলিম ও এফাজ।

কলিমের চেহারা বেশ গাঁট্টাগোট্টা। দেখলেই মনে হবে কর্মক্ষম দেহ। দেহের যেখানে সেখানে মাংসপেশি উঁচু উঁচু হয়ে আছে। বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেলেও দেহের বাঁধনে কোথাও শিথিলতা নেই। বাঘের মতো মুখখানাতে সামান্য দু'একগাছি গোঁফ ও দাড়ি আছে।

সুন্দরবনের গহন অরণ্যে মৈঁশেলী নদী। খুব বড় না হলেও, ছোটও নয়। বাঁক নিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেছে বনের মধ্যে। এপার ওপার দু'পারেই বন। এপারে চড়ার ওপর কেওড়া গাছের ঝাড় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘন সবুজ পাতায় ঢেকে আছে তাদের শাখা-প্রশাখা। ওপারে ভাঙন ধরেছে। বান, সুন্দরী, তবলা, গরান—সব গাছ যেন মিলেমিশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনের গভীরে যেমন গাছগুলি হয়, তেমনি। লম্বা লম্বা গুঁড়িগুলি স্পষ্ট দেখা যায়; মাথায় পাতার ছাতা। জোয়ারের টানে ডিঙিখানি পুব কিনারা ধরে চলেছে কেওড়া গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

কলিম ও এফাজ ঘরে ফিরছে আজ সকালে। গিয়েছিল বন-কর অফিসের ডাকে। কলিম 'বাউলে'। বাঘের বাওয়ালির ডাক পড়ে সুন্দরবনে যখন তখন। নাম-করা 'বাউলে' হলে তো কথাই নেই।

কলিম কোন কাজেই পিছ-পা হয় না। তবে একটা জিনিস তার চাইই। হুঁকো না হলে তার চলে না। তামাক এত ভালোবাসে যে বলবার নয়। বোঠে হাতে নিয়ে হাল বেয়ে চলেছে। দু'হাত দিয়ে নয়।

এক পা আর এক হাত দিয়ে। বোঠের মাথা পর্যন্ত ডান পা তুলে দিয়েছে, আর বাঁ হাত দিয়ে বোঠের মাঝখানে ধরেছে। ডান হাতে হুঁকো। টেনে চলেছে অনর্গল। ভারি আয়েশী ও আরামের হাল ধরা।

পরনে আট-হাতি কাপড়, তাও আবার গুটিয়ে টেনে পরা। তাগড়া পায়ের গোছা তালে তালে দুলছে স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ দুটি কিন্তু দেহের তুলনায় ছোট। ছোট বললে ভুল হবে; চোখের উপরটা মাংসল, তাই চোখ দুটো ছোট দেখায়। ভারি হাসি-খুশি। সব সময় রসাল গল্প করবে আর হাসবে। অদ্ভুত ভ্রূ কুঁচকে হাসবে। চল্লিশ বছর ধরে সে-হাসির রেখা কপালে দাগ হয়ে বসে গেছে। ওর দিকে তাকালে কারও গম্ভীর হয়ে থাকবার জো নেই।

কলিম পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে আছে, আর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ফাঁকে ফাঁকে বেশ দেখা যায়, মুচকি হাসছে।

—চাচা, হাসছ কেন ? —এফাজ হেসে ফেলেই প্রশ্ন করল।

—নাঃ, বন-কর বাবু বলে কিনা, একটা বাঘও মারতে চায়, কুমিরও মারতে চায়। শিকারী হবার শখ দেখ-না ! বললাম, 'বাবু, বাঘ কখনও দেখেছেন ?'

—না।

'বাবু, কেঁদো দেখেছেন ?'

—না।

'বাবু, খাটাস দেখেছেন ?'

—না। 'বাবু, বিড়াল দেখেছেন ?'······

দু'জনেরই হাসি থামতে সময় লাগে। বাঘ-কুমিরের কথাটাই এফাজের কানে বিঁধেছিল। হাসি থামতেই উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে, —আচ্ছা চাচা, তুমি তো জীবনে বাঘ নিয়েই কাটালে, বাঘে-কুমিরে কখনও লড়াই দেখেছ ?

—লড়াই ? না, লড়াই দেখিনি তো।···তবে, বাঘে-কুমিরে

কোলাকুলি দেখেছি।

—কিরকম?

—হ্যাঁ, সত্যি কোলাকুলি, একেবারে চার হাত-পায়ে ভালোবাসার কোলাকুলি!

এফাজ আরও অবাক। ব্যগ্র হয়ে এক-নজরে তাকিয়ে বলে, —কিরকম?

কলিম বেশ গম্ভীর হয়ে বলে,—শুনবি? শোন্ সেবার মালঞ্চ নদীর মোহনায় কূলে কূলে বেয়ে চলেছি। ভোর বেলা। দূর থেকে দেখি, একটা বাঘ চরে শুয়ে আছে। ওভাবে বাঘকে কখনও চরে শুতে দেখিনি। দূরে ডিঙি আলগোছে ভিড়িয়ে সতর্ক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। হাততালি দিলাম, হেঁকে কথা কইলাম। তবুও ঘুম ভাঙে না যেন। নাঃ, একটা-কিছু হয়েছে ভেবে সাহস-ভরে এগিয়ে যাই। দেখি ·····

এফাজের যেন আর তর সয় না,—কি দেখলে?

—দেখি, বাঘ ও কুমিরে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে।

—ঘুমিয়ে আছে?

—দেখি, বাঘ একপাশ দিয়ে কুমিরের গলা কামড়ে, আর কুমির আরেক পাশ দিয়ে বাঘের গলা কামড়ে দু'জনে চার হাত-পা জড়িয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে।

জ্যান্ত?

কি জানি ভয়ে ভয়ে কাছে যেতেই দুর্গন্ধের ঝলকে নাক বন্ধ করতে হলো।

—ওঃ বুঝেছি, এই বুঝি তোমার বাঘের কেরামতি! বোঝা গেছে চাচা, তোমার বাঘের ক্ষমতা!—এফাজের গলায় একটা যেন তাচ্ছিল্যের সুর।

কলিম অন্য সব বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা আমোদ করবে, কিন্তু বাঘের প্রতি কোনও অবজ্ঞা যেন সহ্য করতে পারে না। বলল,—দেখ্ এফাজ,

আর যা করিস ও-জীব নিয়ে ওরকম হেলাফেলা করবি না।

—রেখে দাও তোমার কথা। দেখা আছে তোমার বনবিবির বাহনকে।

—কোথায় দেখলি ?

—দেখেছি, এই তো সেদিন চৌকুনির শিকারী একটা মেরে গাঁয়ে নিয়ে এসেছিল।

একটা ব্যঙ্গের হাসি কলিমের ঠোঁটের কোণে,—ওঃ, মরা বাঘ দেখে এতো হম্বিতম্বি।—পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বনের দিকে তাকিয়ে বলল,—দেখ্ এফাজ, বনে বসে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নেই।

ডিঙি এগিয়ে চলে। নদীতে কোথাও আর কোন ডিঙি নেই। থাকবার কথাও নয়। এবার কাঠ-কাটবার ঘের পড়েছে রায়মঙ্গল নদীর বাদাতে। কাজেই এদিককার বনে কোনও নৌকো বা ডিঙির দেখা পাবার আশা নেই।

হেমন্তের নরম সকাল। ঝিরঝির হাওয়ার সঙ্গে সকালের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে। যেদিকে তাকাও ঘন সবুজ বন। ছোট শুভ্র নদী এঁকেবেঁকে এগিয়ে অবশেষে বাঁক নিয়ে বনের আড়ালে চলে গেছে। ···সব-কিছু মিলে কলিমের মনকে আনমনা করে তোলে।

বাওয়ালি একটা গানের কলি গুন্‌গুন্ করে ওঠে। কাঁখে ভরা-কলসীর জল যেমন ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে, তেমনি ভরা-নদীতে জোয়ারের টানে আর মৃদু উত্তরে-বাতাসে মাঝদরিয়ার জল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গভীর বনের নিস্তব্ধতায় তার সুর কানে ধরা না দিয়ে যায় না।

একটা-কিছু হঠাৎ আবিষ্কারের উৎসাহ নিয়ে এফাজ আঙুল দেখিয়ে বলে,—চাচা! ঐ না একটা হরিণ এপারে সাঁতরে পার হয়ে আসছে ? ঐ যে কান দুটো দেখা যায়!

—কই ?—বলেই কলিম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—এফাজ!

হরিণ না, সাবধান কিন্তু। সাবধান।

সাঁতরে আসবার গতি ও তার মতলব বুঝবার জন্য কলিম বোঠে থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কলিমের সাবধান-বাণীতে এফাজের মুখ ফ্যাকাসে। তার হাতেও একখানা বোঠে ছিল। ভয়ে ভয়ে লাঠি বাগাবার মতো সেখানা ধরবার চেষ্টা করে। দাঁড়াতে সাহস পায়নি। গুটি মেরে বসেই আছে। বুক দুরুদুরু করলেও একটা সাহস আছে ওর মনে,—হরিণ হোক, আর যেই হোক, ও জলে আর আমি চলন্ত ডিঙিতে। জলে না পড়লেই হলো।—তাই সে ডিঙির উপর দাঁড়াতে যায়নি।

কিন্তু ও যেই হোক, ওকে এড়িয়ে যেতে হবে। কলিম হাল থামালেও ডিঙি থামে না। স্রোতের টানে ধীরে ধীরে এগিয়েই চলেছে। না, এভাবে এগিয়ে গেলে হবে না। সামনা-সামনিই দেখা হয়ে যাবে। তবে কি ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে পেছনে হটবার চেষ্টা করবে? না—খরস্রোতের মুখে ডিঙির মুখ ঘুরুলেই তার আগেকার গতি থামে না। স্রোতের টানে তখনও সমানে এগুতে থাকবে। সে গতি থামাতে থামাতে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে মাঝ-নদীতেই........
কলিম আর চিন্তা করতে চায় না। চিৎকার করে তাড়া লাগিয়ে বলল,—শিগ্‌গির বোঠে ধর্। আসবার আগেই ওকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

কলিম বলল বটে এবং নিজেও দেহের সর্বশক্তি দিয়ে বোঠের টান দিল, কিন্তু এফাজ যেন কেমন হয়ে গেছে। বোঠেই এখন তার একমাত্র অস্ত্র। সে নিরস্ত্র হতে যেন চায় না। যেমনভাবে লাঠির মতো করে ধরে ছিল, তেমনিভাবে ধরে রইল।

কলিমের আশঙ্কা মিথ্যা নয়। মাঝ-নদীতে আসতেই আরও যেন জোরে সাঁতরে আসছে। হয়তো ডিঙি তার লক্ষ্য নয়, হয়তো মাঝ-নদীর প্রবল টানে পড়ে জোরে সাঁতরে পার হতে চেয়েছে। কিন্তু

কলিম প্রমাদ গুনলো। সুন্দরবনের হিংস্রতম জীব। বাঘের চোখ ও মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। বাঘ ও ডিঙি এবার মুখোমুখি।

এফাজ স্থির থাকতে পারে না। বাঘ নিকটে আসতেই দু'হাতে বোঠে বাগিয়ে মারবার ভঙ্গি করে।

কলিম যেন আর্তনাদ করে উঠল,—করিস কি! করিস কি!

এফাজ 'ডাঙায় বাঘের' খবর রাখে না। সুন্দরবনের এই জীবকে অস্ত্র উদ্যত করে ভয় দেখানো যায় না—সে বন্দুক হলেও না। ওর হিংস্র চাহনি আর গর্জনের সামনে হাত তো দূরের কথা,—সর্বদেহ অবশ হয়ে আসে।

কিন্তু বাঘ এখন জলে ; নাকের ডগা অবধি জলে ডোবা। আর ও নিজে ডিঙিতে। সাহস-ভরে ভয় দেখাবার সুযোগই বটে!!

কলিম আর্তনাদ করে বিপদ এড়াতে চাইলে কি হবে! এফাজের উদ্যত বোঠে শূন্যে উদ্যত হয়েই রইল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র গাঁগাঁ গর্জন করে যেন জলের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে। বুক পর্যন্ত উঁচু করে থাবা বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ডিঙির গলুই ও এফাজই তার লক্ষ্য ছিল। থাকলে কি হবে, জলে ঝাঁপিয়ে থাবা মারবার আন্দাজ ওর নিশ্চয় নেই। চলতি ডিঙি এগিয়ে যায়। মুহূর্তে চোখ-মুখের জল ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে আবার হেঁকে ওঠে বুক পর্যন্ত জলের উপর তুলে। দু'হাতে এক সঙ্গেই যেন থাবা মারবে। কলিমও সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে ওঠে, বাওয়ালির বেপরোয়া প্রতি-আক্রমণ—শালা! এগুবি তো শেষ করব! খবরদার!

বাওয়ালি বোঠে উদ্যত করে না। শুধু বুক ফুলিয়ে হিংস্র মুখ করে গলুইতে হাঁটু গেড়ে খুঁটি নিল। যেন সে বোঝাপড়া করতে চায় এই ভীষণ জানোয়ারের সঙ্গে।

ডিঙি স্রোতের টানে খানিকটা এগিয়ে গেছে। এবারের

আক্রমণে বাঘের দুই থাবা পড়ল মাঝ-ডিঙির ডালিতে। থরথর করে কেঁপে ওঠে ডিঙি। বাঘের হিংস্র চোখের উপর তার রক্ত-চক্ষু রেখেই কলিম এক-ফাঁকে গর্জন করে বলল,—এফাজ, খবরদার নড়বি না। বসে থাক্।

এফাজ হতভম্ব হয়ে বসেই আছে। বাঘ নিরস্ত হতে চায় না। ভ্রূক্ষেপ নেই তার কলিমের গোঙানি ও গালাগালিকে। এক ঝাঁকানি দিয়ে দুই থাবায় ভর করে উঠে পড়ল ডিঙির উপর। সরু ডিঙিতে তাল সামলাতে এত বড়ো জানোয়ারের একটু সময় যায়। গোঁগোঁ গর্জন ও রাগ তার একটুও থামেনি।

ডিঙির খোলে চার পা রেখে কোনমতে তাল সামলে নিয়েছে। এফাজের দিকেই মুখ করে আছে, লক্ষ্যও সেদিকে। কলিম আচমকা অনুভব করল, এফাজ এই মূর্তির সামনে ধীরে ধীরে বুঝি আড়ষ্ট হয়ে আসছে। ভীষণ জোরে চিৎকার করে বলল—এফাজ! এফাজ! শিগ্‌গির পানিতে পড়, পানিতে পড়!

হুঁকো-কল্‌কে কাছেই ছিল। কোন উপায় না দেখে, 'পানিতে পড়' 'পানিতে পড়' বলতে বলতে কলিম ক্ষিপ্র বেগে ছুঁড়ে মারল কল্‌কে এফাজকে লক্ষ্য করে।

কল্‌কের আঘাতে এফাজ সম্বিত যেন ফিরে পেল। ঝপাং করে পড়ল জলে। এফাজের দিকেই বাঘ একটা গুঁয়ো ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল। কলিম অমনি চিৎকার করে,—ডুব দে! ডুব দে!

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত দাঁতে গোঁঙানি। বাঘ ঘাড় বেঁকিয়ে হিংস্র চাহনি দিয়েছে কলিমের প্রতি। কলিম পিছপাও হতে চায় না। হাঁটুর উপর উঁচু হয়ে বুক চিতিয়ে সে-ও বারবার গর্জন করতে থাকে,—শালা, এগুবি তো শেষ করব!

তবু বাঘ যেন বাগ মানতে চায় না। ওর দিকে দু'পা এগুতে হবে, নইলে বাঘ কখনও পিছু হটতে চায় না। কলিমের বাঘের সামনে রুখে দাঁড়াবার পন্থাই এই। কিন্তু সে তো মাটির উপর

দাঁড়িয়ে এই হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার কায়দা। এ যে নদীর মাঝে ডিঙির উপর বোঝাপড়া। কলিম এগুবে কোথায়? এগুলে যে বাঘের থাবার মধ্যে এসে যেতে হয়! তবে কি হাতা-হাতিই করবে?

হঠাৎ কলিম মনস্থির করে বসে। গালাগালি করতে করতে আর চাহনি বাঘের দিকেই রেখে ঝপাং করে সে-ও জলে পড়ল। জলে পড়ে, কিন্তু ডিঙি ছাড়ে না। এক হাতে গলুই ধরে রইল। আরেক হাতে আগের মতোই শাসাতে থাকে।

বাঘ বুঝেছে, সে জয়ী—কলিম পলাতক। বীরবিক্রমে এগিয়ে এলো কলিমের দিকে। তার দৃষ্টি, কলিমের গলুই আঁকড়ে ধরা হাতখানার দিকে। দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে আসে। একবার হাতখানা কামড়ে ধরতে পারলে হয়। তারপর এক ঝাঁকানিতে টেনে তুলবে ডিঙির উপর। কলিম তবুও ডিঙি ছাড়তে চায় না।

স্রোতের টানে সবাই ভেসে চলেছে। এফাজ সাঁতরে ভেসে চলেছে ডিঙির বেশ কিছুটা আগে আগে। একবার তীরের দিকে এগিয়ে চলেছিল। তৎক্ষণাৎ কলিম যেন মারমুখো হয়ে ওঠে,— খবরদার! ডিঙির কাছাকাছি থাক।—এফাজ ডিঙির কাছাকাছি আছে বটে, কিন্তু প্রায় ডুবেই আছে। কোনমতে এক-একবার মাথা তুলে দম নেয়, আবার ডুব দেয়।

বাঘও চলেছে ডিঙিতে ভেসে ভেসে।

কলিমও চলেছে ভেসে ভেসে ডিঙির গলুই ধরে। তার লক্ষ্য, যেন কোনমতেই ডিঙি কূলের দিকে না যায়।

বাঘ এবার কলিমের অতি সন্নিকটে। প্রায় তার থাবার মধ্যেই। পেছনের পা ভেঙে বসেই পিঠটা লম্বা করে থাবা মারল। পেছনের পা ভাঙতেই কলিম ঝট্‌ করে হাত সরিয়ে নিতে চাইল। চাইলে কি

হবে ? হাত সরাতে না সরাতে হিংস্র বাঁকা নখে হাতের খানিকটা মাংস উড়ে গেল। হাতাহাতির ধাক্কায় এক পাক খেল ডিঙি।

এফাজের গলুই ঘুরে এসেছে এপাশে। কলিম অমনি জাপ্‌টে ধরল ক্ষত হাতেই। পিছু হটলে যে রক্ষা নেই। হাত থেকে তখন তার রক্ত ঝরে পড়ছে।

ডিঙি ঘুরতেই বাঘ দূরের গলুইতে। আবার এফাজের সামনে। কলিম শাসিয়ে উঠল,—ডুবে থাক্, ডুবে থাক্।—এফাজ ডুবে তো থাকবেই! ছিলও ডুবে, কিন্তু সুন্দরবনের জলেও নিস্তার নেই! কুমির ও কামট যেন কিলবিল করে। তবু বাঘের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে, এ-যাত্রা কুমির কামটের ভয় করলে চলবে না। তাই বেপরোয়া হয়ে দু'জনেই জলে পড়ে আছে।

এদিকে এফাজ জলের তলে। বাঘ কিছুই দেখে না। ঘাড় বেঁকিয়ে কলিমের দিকে আবার নজর দিল। কলিম লুকিয়ে নেই। গর্জে ও শাসিয়ে চলেছে। বাঘ গুঁরো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আবার কলিমের দিকে এগিয়ে এল। কলিম আগে থাকতে সতর্ক হয়ে আছে। বাঘ আসতেই বোঁ করে ডিঙি ঘুরিয়ে দেয়। এবার কিন্তু গলুই ঘুরে এলে জাপ্‌টে ধরে না। ধাক্কা দিয়ে বোঁ-বোঁ করে চরকির মতো ঘোরাতেই লাগল।

চরকি পাক খেয়ে বাঘ গোঁগোঁ করে বটে, কিন্তু কি যে করবে যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এফাজ নোনা জলের শুশুকের মতো বারবার ডুব দিয়েই চলেছে। ঘুরপাক খেয়ে বাঘ ঝোঁক দিয়েছে জলে পড়বার। কলিম বেপরোয়াভাবে একটানা চিৎকার করে—সাবধান! সাবধান! একদম ডুবে থাক্।—যাতে এফাজ ডুব দেবার ফাঁকে ফাঁকে কোনমতে শুনতে পায়।

এবার তিনজনেই জলে। নিঃসাড় বনের মাঝে মৈঁশেলী নদীর স্রোতের টানে হিংস্র শিকারী আর তার সাক্ষাৎ লব্ধ দুই লোভনীয় শিকার।

—ডুবে থাক্, ডুবে থাক্—বলতে বলতে কলিমও জলের গভীরে ডুব দিল। একাব্ব ডুবেই আছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে আরও কিছুক্ষণ ডুবে থাকতে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, তবু ডুবে থাকে জোর করে। নোনা পানির ঢোক গিলে গিলে আরও···আরও কিছুক্ষণ থাকতে চেষ্টা করে।

দু'মিনিট পরে দু'জনেই উঠে দেখে—আগের মতো কান আর নাকের ডগা উঁচু করে ডাঙার জীব ডাঙা-মুখো। বেশ কিছুদূর এগিয়েও গেছে। হিংস্র জানোয়ার নদী পার হতে চেয়েছিল। পার হয়েই ওপারে চলল। ফেলে আসা শূন্য ডিঙিখানি তখনও মাঝ-নদীতে ধীর গতিতে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। কে শিকার, কেই বা শিকারী, কে ঘাতক, কেই বা পলাতক—সবই যেন মৈঁশেলী নদীর লোনা পানির ঘোলায় ঘুলিয়ে যায়!

শান্ত নদীতে ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলে দুলে ডিঙি এগিয়ে চলে। সামান্য দু'একটা কথা ওরা যা বলেছে, শান্ত বনে তাও প্রতিধ্বনিত হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। নিস্তব্ধ আসরে তারের ঝংকারের রেশ ঠিক যেভাবে মিলিয়ে যায়। কে বলবে, এই কিছুক্ষণ আগেও এই নিঝুম নিরালা বনে প্রশান্ত নদীর জলে কী প্রলয় কাণ্ড চলেছিল!

জল থেকে ডিঙিতে উঠে ক্লান্ত একাব্ব একবার গা এলিয়ে দম নিতে চেয়েছিল। দেয়নি কলিম তাকে বিশ্রাম নিতে। দ্রুত ছেড়ে যেতে হবে যে এই এলাকা।

এতক্ষণে সে-এলাকা অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। দু'জনেই বিশ্রাম নিতে ব্যাকুল। সহসা বোঠে থামিয়ে কলিম বেশ কিছুক্ষণ বনের দিকে লক্ষ্য করে বলল,—একাব্ব! না, হলো না! থামলে রক্ষা

নেই! বোঠে ধর্। চরে তো একটা বানরও দেখছি না, সবই তো গাছে গাছে। তেমোহনায় বাঁ দিকের নদীতে আগে পড়ে নিই, তারপর বিশ্রাম-টিশ্রাম! নে, ধর্।

সকালে রোদে নদীর চরে বানর দলে দলে আসে। পলিমাটির চরে কচি ঘাসের মুথো খুঁজে বেড়ায়। বানরের দলকে গাছ থেকে চরে নামতে না দেখেই ওদের আশঙ্কা।

কলিম বলল,—জানিস্, ও-শালা ঠিক পিছু পিছু এসেছে। দেখবি? দেখতে চাস্ তো তেমোহনায় ঠিক দেখতে পাবি।

—না চাচা, দেখতে চাই না! তোমায় দেখাতে হবে না।

ত্রিমোহনায় মৈঁশেলী ফেলে ডিঙি বাঁ দিকের কয়রা নদীতে পড়বে। কয়রায় পড়তেই কলিম আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল,—ঐ গ্যাখ্, ঠিক শালা এসেছে। বনের আড়ালে আড়ালে ডিঙির ঠিক পিছু পিছু এসেছে। ঐ গ্যাখ্, এবার ছেড়ে চলে যাব বলে কেমন করে মুখ বাড়িয়ে দেখা দিয়েছে! গ্যাখ্!

একাব্দ বিহ্বল হয়ে বলল,—না চাচা, আঙুল দেখিয়ে অমন তাচ্ছিল্য করে কথা বলো না।